হৃদয়ের ঘ্রাণ

প্রফুল্ল রায়

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫, কল্যাণী
নদীয়া

ব্যবস্থাপক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক :
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

হৃদয়ের ঘ্রাণ

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

মধ্যপ্রদেশের এই গঞ্জটার নাম আভনপুর। অঘ্রাণ মাস পড়তেই এখানে মরসুম এসে গেল।

সারা তল্লাটে এই একটা মাত্র গঞ্জ। আর সারা বছরে এই একটাই মরসুম। কাজেই চারপাশের যত ব্যবসাদার যত শেঠ আর যত দেহাতী মানুষ—সবাই যেন উন্মুখ হয়ে ছিল। অঘ্রান মাস পড়তেই তারা আভনপুর আসতে শুরু করেছে।

গঞ্জটার সামনে দিয়ে জেলাবোর্ডের সড়ক গেছে। ক'দিন আগেও সড়কটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। তার শান্তি ছিল অবাধ এবং নিবিঘ্ন। সমস্ত দিনে যে দু-পাঁচজন আদিবাসী মানুষ আর এক-আধখানা মোষের গাড়ি দেখা যেত, তারাও যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলত। এই সডকটার যত আলস্য আর যত ঘুম তাদের ওপর যেন ভর করে বসত।

ইদানীং ঘুমন্ত ভাবটা কেটে গেছে। জেলাবোর্ডের সড়ক সবগরম হয়ে উঠেছে।

আশপাশের মানুষ তো আসছেই। সেই বিলাসপুর রায়পুর থেকে, বস্তার জেলার দেহাতী গ্রামগুলো থেকে দিবারাত্রি মোষের গাড়ি আসছে। আর আসছে ঘোড়ায়-টানা সারি সারি টাঙা।

টাঙায়, মোষের গাড়িতে আর মানুষের ভিড়ে আভনপুর এখন জমজমাট।

গঞ্জটার এক দিকে জেলাবোর্ডের সড়ক, আর এক দিকে ছোট পাহাড়ী নদী। নাম তার বতিয়া। বতিয়ার পার ধরে সারবন্দি হাটের চালা। এই সেদিনও চালাগুলো ফাঁকা পড়ে ছিল। সব সময়ের বাসিন্দে গুটিকয়েক অনাথ কুকুর ছাড়া তাদের দখল নেবার জন্য কেউ ছিল না।

হাটের চালাগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে ছোট বড় অসংখ্য গুদাম। এতকাল সেগুলো তালাবন্ধ ছিল।

মানুষ আসাতে গুদামের তালা খুলে গেছে। হাটের চালা থেকে কুকুরগুলো উদ্বাস্তু হয়েছে।

ধান আর গমই এখানকার প্রধান ব্যবসা। প্রধান হলেও একমাত্র নয়। আমলকি-হর্তুকি-মধু-মোম-বাঘছাল—এমনি নানা জিনিস এখান থেকে চালান যায়। তবে ধান-গমের তুলনায় সে-সব খুবই নগণ্য।

এই মরসুমের সময়টা সারাদিন বেচাকেনা চলে। দরাদরি হাঁকাহাঁকিতে গঞ্জটা গম গম করতে থাকে।

শুধু ধান-গমের খাতিরেই না, এ-সময় নানা ফিকিরে নানা মানুষ আভনপুরে আসে। কেউ এসে জুয়ার আড্ডা বসায়। কেউ শরাবের দোকান খোলে। জুয়ার আড্ডা বসবে, শরাবের দোকান খুলে যাবে আর বিলাসপুরী স্বৈরিণীরাই শুধু বাকী থাকবে? না। দেহের সওদা নিয়ে তারাও আসে। তারা না এলে ষোলকলা কখনও পূর্ণ হয়!

আভনপুরের এক প্রান্তে তাদের তাঁবু পড়ে। সমস্ত রাত সেই তাঁবুতে বর্বর যুগের উৎসব চলতে থাকে।

কিন্তু এখানে এই আভনপুরের গঞ্জে মরসুম আর ক'দিন? মাত্র দুটো মাস। অঘ্রানের প্রথম দিকে শুরু, মাঘের মাঝামাঝি শেষ। সারা বছরে এই দুটো মাসই এখানকার ধমনী সচল থাকে। এই দুটো মাসই এখানকার জীবনে যা-কিছু চমক, যা-কিছু উত্তেজনা।

তারপরেই যেন ভোজবাজি ঘটে যাবে। অঘ্রান মাস পড়তেই যে মানুষগুলো আসতে শুরু করেছে, মাঘের মাঝামাঝি তারা চলে যাবে। যে টাঙা আর মোষের গাড়িগুলো সামনের সড়কটাকে জমকালো করে রেখেছে, তাদেরও আর দেখা যাবে না। গঞ্জ আর সড়ক তখন খা-খা করতে থাকবে।

মরসুমের এই দুটো মাস বাদ দিলে বাকী দশ মাস আভনপুর একেবারে বেকার। সে সময় তার ব্যস্ততা নেই, চাঞ্চল্য নেই, জলুস নেই। অন্তহীন এক আলস্য তখন তাকে বুঁদ করে রাখবে।

দুই

অন্য সব বছরের মত এবারও টাঙা হাঁকিয়ে এল ছকুরাম।

এখন বিকেল।

আভনপুরের আকাশটা যেন প্রজাপতির মস্ত এক পাখা। লাল-নীল-সোনালী—সেখানে হাজার রঙের মেলা বসেছে।

টাঙা নিয়ে সরাসরি গঞ্জে গেল না ছকুরাম। আভনপুর বাঁয়ে রেখে জেলাবোর্ডের সড়ক ধরে সোজা এগিয়ে চলল।

সড়কটার দু-পাশে সীমাহীন প্রান্তর। যতদূর চোখ যায়, লাল মাটির অসংখ্য ঢেউ স্তব্ধ হয়ে আছে। সৃষ্টির সেই আদিম দিনগুলিতে পৃথিবীটাকে নিয়ে যে নিদারুণ তোলপাড় চলেছিল, তার কিছু কিছু স্মৃতি মধ্যপ্রদেশের এই প্রান্তরগুলিতে ছড়িয়ে আছে।

মাথার ওপর বিকেলের রংবাহারি অপরূপ আকাশ। একবারও সেদিকে তাকাচ্ছে না ছকুরাম। এখন আকাশ দেখার সময় কোথায়?

তা ছাড়া অঘ্রান মাসের এই শেষ বেলাটা আর কতক্ষণ? একটু পরেই এত রং, এত বাহার থাকবে না। আকাশের প্রজাপতি ডানা মুড়ে কোথায় অদৃশ্য হবে।

ছকুরাম ভাবল, দিনের আলো থাকতে থাকতে ধনপতের ডেরায় পৌঁছতে হবে, নইলে বিপদ হতে পারে।

এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যে বস্তার জেলার শালবন। সন্ধে হলেই সেখান থেকে বাঘ বেরিয়ে পড়ে।

কাজে কাজেই যে বেঁটে টাট্টুটা টাঙাটাকে কাঁধে নিয়ে

ছুটছিল, তার পিঠে সপাং করে চাবুক বসিয়ে দিল ছকুরাম। টাট্টুটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

সন্ধের অনেক আগেই ধনপতের গ্রামে এসে পড়ল ছকুরাম। গ্রামটার নাম গৌরীগাঁও।

মধ্যপ্রদেশের গ্রাম। শ্রী নেই, ছাঁদ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রান্তর ফুঁড়ে লাল মাটির কতকগুলো ঢিবি বিশৃঙ্খলভাবে মাথা তুলে আছে। কাছাকাছি এলে বোঝা যায়, ওগুলো ঢিবি না, ঘর। মানুষের বসতি।

পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন একখানা গ্রামের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের এই সৃষ্টিছাড়া প্রান্তরে ঢিবিগুলো আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

একটা ঢিবির সামনের এসে টাঙা থামাল ছকুরাম। এটা ধনপতের ডেরা। ছকুরাম ডাকল, 'ধনপতজি—'

কেউ জবাব দিল না।

টাঙা থেকে নেমে পড়ল ছকুরাম। ঢিবিটার খুব কাছে এসে আবার ডাকল, 'ধনপতজি—এ ধনপতজি—'

এবার সাড়া মিলল, 'কৌন ?'

'আমি ছকুরাম।'

'আরে আরে, তুম—' বলতে বলতে ধনপত নামধারী লোকটা ঢিবির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

বেশ বয়স হয়েছে ধনপতের। মাথাটা ধবধবে সাদা। আঁতি-পাঁতি করে খুঁজলে দু-চারটে কালো চুল হয়ত পাওয়া যায়।

দেহের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। মুখময় অজস্র কুঞ্চন। পিঠটা অনেকখানি দুমড়ে সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। এতখানি বয়স হয়েছে, শরীর প্রায় অথর্ব, তবু আশ্চর্য সজীব ধনপতের চোখদুটি। শুধু সজীবই না, সরলও। এই সারল্যমেশা চোখদুটির দিকে তাকালে মনে হয়, ধনপতের বৃদ্ধ শরীরের মধ্যে যার বাস,

সে একটি অবোধ শিশু। সেই শিশুটির বয়স কোনদিন বাড়ে না।

ধনপতের বেশবাস খুবই সংক্ষিপ্ত। কোমর থেকে একটা ময়লা টেনি হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই টেনিটা ছাড়া সমস্ত দেহে আবরণের আর কোন বাহুল্য নেই। খুব সম্ভব প্রয়োজনও নেই।

ধনপত এগিয়ে এল। খুশী গলায় বলল, 'আমি জানতাম, আজকালের মধ্যেই তুমি আসবে।'

'তুমি জানতে?'

'জরুর।' ধনপত বলল, 'এখানে মরসুম পড়ে গেছে। আর তুমি আসবে না!'

ছকুরাম মুখে কিছু বলল না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল।

একটু চুপচাপ।

ধনপতই আবার শুধলো, 'কখন এসেছে ছকুয়া?'

'এই মাত্তর।'

'আভনপুরের গঞ্জে যাও নি?'

'না। সিধা তুমহার এখানে চলে এসেছি।'

'বেশ করেছ।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ধনপত, 'চল চল, অন্দর চল—'

'অন্দর তো যাবই। তার আগে একটা কাজ।' ছকুরাম বলল।

'কী?'

টাঙা বোঝাই করে মালপত্তর এনেছে ছকুরাম। ধনপতকে সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'সামানগুলো (মালগুলো) নামাতে হবে।'

'হাঁ—হাঁ—' ধনপত সায় দিল।

টাঙা থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলল ছকুরাম। তারপর টানাটানি করে ঢিবিটার মধ্যে নিয়ে এল।

ঢিবির মধ্যে তিনখানা ঘর। ঘর বললে যথেষ্ট বলা হয়। অতখানি মর্যাদা তাদের প্রাপ্য নয়।

চারপাশের মাটির দেওয়াল, ওপরে সাজু ঘাসের চাল। জানালার

বালাই নেই। সামনের দিকে একটা করে ফোকর। ওগুলো দরজা। ফোকরগুলো এত ছোট যে প্রমাণ চেহারার একজন মানুষকে প্রায় হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

একটা ঘরে মালগুলো রেখে বেরিয়ে এল ছকুরাম।

ধনপত বলল, 'যাও ছকুয়া, কুয়া থেকে হাতমুখ ধুয়ে এস। গান্ধা কাপড়াটা বদল করে ফেল।'

কি একটু ভাবল ছকুরাম। তারপর বলল, 'লেকেন—'

'কী?'

'টাট্টুটা বাইরে রয়েছে। ওটাকে আনতে হবে। দানাপানি দিতে হবে।'

'ওসব আমি করব'খন। তুমি হয়রান হয়ে এসেছ। হাতমুখ ধুতে যাও।'

'না।'

'না কেন?' দু-চোখে বিস্ময় নিয়ে ছকুরামের দিকে তাকিয়ে রইল ধনপত।

'টাট্টুটাকে তুমহার আনতে হবে না। আমার কোন কাম তুমহাকে করতে হবে না।' ছকুরামের গলাটা কেমন যেন রূঢ় শোনাল। বলেই আর দাঁড়াল না সে। টাঙা থেকে টাট্টুকে খুলে ভেতরে নিয়ে এল। তারপর ক্লান্ত পশুটাকে কিছু শুকনো ছোলা খেতে দিয়ে কাপড় আর গামছা নিয়ে কুয়োর দিকে রওনা হল।

কুয়োটা কোথায় বলে দিতে হল না। ছকুরাম তা জানে। শুধু কুয়োটাই না, এ বাড়ির কোথায় কি আছে, সবই তার জানা। ধনপতের এই ডেরাটার সঙ্গে তার অনেক কালের পরিচয়।

ঘরের সামনে দাওয়া। দাওয়ার পর থেকে উঠান। উঠানের এককোণে প্রকাণ্ড এক পিপুল গাছের তলায় কুয়োটা। সোজা সেখানে চলে এল ছকুরাম।

অনেকটা পথ টাঙা হাঁকিয়ে এসেছে। রাস্তার ধুলোয় চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে। ঘামে শরীরটা চটচটে। জামা-কাপড় থেকে

ধুলো এবং ঘামে মেশা বোটকা গন্ধ উঠে আসছে। ভারি অস্বস্তি লাগছে ছকুরামের।

ধনপত তাকে হাতমুখ ধুয়ে যেতে বলেছে। ছকুরাম ভাবল, শুধু হাতমুখ ধুলেই চলবে না। চানই করে ফেলতে হবে। চান না করলে শরীরটা হাল্কা হবে না।

কুয়ো থেকে জল তুলে গায়ে মাথায় ঢালতে লাগল ছকুরাম

ছকুরাম আর ধনপত—এমনিতে এই দুটি মানুষের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

ধনপত ছকুরামের আত্মীয় না, স্বজন না। এমন কি সমবয়সী বন্ধুও না। ধনপতের বয়স প্রায় ষাট, ছকুরামের তিরিশ পঁয়াতরিশ। চলিত অর্থে যা বন্ধুত্ব, দ্বিগুণ বয়সের একটা মানুষের সঙ্গে আর যাই হোক তা হয় না। যদিই হয়, সে বন্ধু স্বাভাবিক নয়।

তা ছাড়া দু-জনের দেশও এক নয়। দুজন দু-জায়গার লোক। ধনপতের দেশ এই মধ্যপ্রদেশ, ছকুরামের দেশ বিহার। শুধু দেশই না, দু'জনের জাতও আলাদা। ধনপত গোয়ালা, ছকুরাম মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

সব দিক থেকে এত বৈষম্য তবু দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা এইরকম

প্রতি বছর মরসুমের সময়টা এখানে আসে ছকুরাম। আভনপুরের গঞ্জে তার কারবার আছে

দিনের বেলাটা একরকম কেটে যায়। কিন্তু রাত্তিরে ভারি মুশকিল। রাত্তিরে থাকার মত জায়গা আভনপুরে নেই। হাটের চালা অবশ্য আছে। তাদের চারপাশ খোলা, মাথায় সামান্য ছাউনি কিন্তু মধ্যপ্রদেশে এত শীত আর এদিকটায় বাঘের এত উৎপাত যাতে খোলা চালায় রাত কাটাতে ভরসা হয় না

তাই প্রথম যেবার এখানে এসেছিল ছকুরাম, সেবারই ধনপতের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সারাদিন আভনপুরে কাজ কারবার

চালাবে সে। তারপর সন্ধের মুখে মুখে গোরীগাঁও চলে আসবে। রাত্রিটা ধনপতের ডেরায় কাটিয়ে সকালবেলা আবার আভনপুর ফিরে যাবে!

সেই থেকে এই ভাবেই চলে আসছে।

মরসুমের দিনগুলো তার কাটে আভনপুরের গঞ্জে। আর রাত্রিগুলো ধনপতের ডেরায়। রাত্রিতে থাকা বাবদ প্রতি মরসুম তিনটি করে টাকা সে ধনপতকে দেয়।

দশ বছর নিয়মিত এখানে আসছে ছকুরাম।

দশ বছরের দশটা মরসুম একসঙ্গে কাটালে দুটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই খানিকটা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য! ছকুরাম আর ধনপতের মধ্যে তেমন কিছুই নেই। অন্তরঙ্গতা তো দূরের কথা, সামান্য প্রীতিটুকু পর্যন্ত না।

অবশ্য ধনপতের আন্তরিকতায় কোন ত্রুটি নেই। বার বার সে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। কিন্তু ছকুরামের দিক থেকে সাড়া মেলে নি।

অদ্ভুত মানুষ ছকুরাম!

তিন

কুয়ার জলে চান সেরে এইমাত্র ফিরে এল ছকুরাম। এখনও দিনের আলো আছে। আলোটা খুবই মৃদু, খুবই বিষণ্ণ। তার তেজ নেই, তাপ নেই।

এখন দাওয়ার একধারে চুপচাপ বসে আছে ধনপত। আর উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাট্টুটা ছোলা চিবুচ্ছে।

একটুক্ষণ টাট্টুটাকে দেখল ছকুরাম। তারপর ধনপতের কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে বসে পড়ল।

ধনপত বলল, 'পুরা দশ মাহিনা বাদ তুমহার সাথ দেখা হল। তাই না ছকুয়া?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ছকুরাম। বলল, 'হাঁ—'

বছরে এই একবারই আসে ছকুরাম। মরসুমের দুটো মাস সে এখানে থাকে। তারপর টাঙা হাঁকিয়ে চলে যায়। বছরের বাকি দশ মাস তাকে আর দেখা যায় না।

ধনপত শুধলো, 'এই দশ মাহিনা কী করলে? কোথায় কোথায় ঘুরলে?'

'আমার কথা শুনে ফায়দা (লাভ) নেই।' ছকুরাম বলল, 'তুমহার খবর বল।'

'আমার আবার খবর কি! নয়া কুছু নেই। পিছু সাল যেমন দেখে গিয়েছিলে এখনো তেমনি চলছে।'

প্রতি বছর এখানে এসে ধনপতকে তিনটি প্রশ্ন শুধোয় ছকুরাম। এবারও শুধোতে শুরু করল।

ছকুরামের প্রশ্নটা হল, 'তুমহার কোমরের সেই দরদটা কেমন আছে?'

'ওই একই রকম—' ধনপত বলল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'সখিদের সাথ তুমহার মামলা চলছিল না?'

'হাঁ—'

সখিলাল ধনপতের পড়শী। বিঘে দেড়েক চাষের জমি নিয়ে ক'বছর হ'ল তাদের মধ্যে মামলা চলছে। এ কথা ছকুরাম জানে। সে বলল, 'সেই মামলাটার কুছু ফয়সালা হল?'

'না।'

নিস্পৃহ গলায় ধনপত বলল, 'এটার ফয়সালা আর হবে না। যদ্দিন আমি জিন্দা আছি, ওটাও আছে।'

কি একটু ভাবল ছকুরাম। তারপর তৃতীয় প্রশ্নটি করল তুমহার, সেই ভঁইসাদুটো আছে?'

'এ তো বহুত তাজ্জবের কথা বলছ ছকুয়া!'

'কি রকম?'

'আমি আছি আর ভঁইসা দুটো থাকবে না?'

এরপর ছকুরাম কি বলবে, ভেবে পেল না। ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

আশ্চর্য এই ধনপত। সংসারে সে একা। একেবারে একা। তার না আছে বউ, না আছে ছেলেপুলে। বিয়ে সে করে নি, বউ ছেলেপুলে আসবে কোথা থেকে। দুটো মোষ ছাড়া তার আর কোন সঙ্গী নেই।

দশ বছর আগে ধনপতকে প্রথম দেখেছিল ছকুরাম। সেদিন যেমন দেখেছিল, আজও তেমনিই আছে সে। মাথাটা তেমনি সাদা, পিঠটা তেমনি বাঁকা, চোখদুটো তেমনি সজীব। দশ বছর আগের সেই মোষদুটো আজও তার সঙ্গী। সখিলালের সঙ্গে সেদিনও মামলা চলছিল। আজও তার জের চলছে।

ধনপত নামে মধ্যপ্রদেশের এই মানুষটা দশ বছরে এতটুকু বদলায় নি।

জীবনে নিজের ব্যবসার খাতিরে বহু মানুষের সংস্রবে এসেছে ছকুরাম। কিন্তু দশ বছরে বিন্দুমাত্র বদলায় না, এমন মানুষ এই একটাই দেখেছে সে।

কাছেই বসে রয়েছে ছকুরাম। একদৃষ্টে ধনপতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে।

এদিকে অনেকটা সময় কেটে গেছে।

হঠাৎ ধনপত শুরু করল, ‘ভঁইসা বল, মামলা বল আর কোমরের সেই দরদই বল—পুরানা সবকুছ ঠিক আছে। লেকেন—’ বলতে বলতে চুপ করল সে।

‘লেকেন কী?’ ছকুরাম শুধলো।

‘হালে বড় ভাবনায় পড়েছি ছকুয়া। কি করব, বুঝতে পারছি না।’ ধনপতকে চিন্তিত দেখাল। শুধু চিন্তিতই না, বিচলিতও।

ধনপত ভাবনায় পড়েছে!

যেন অবাকই হল ছকুরাম। অবাক হবারই কথা। মধ্যপ্রদেশের এই মানুষটাকে দশ বছর দেখছে সে। এই দশ বছরের মধ্যে কোনদিন

তার মুখে ভাবনার কথা শোনে নি। হঠাৎ কী এমন হল, যাতে ধনপত বিচলিত হয়ে পড়েছে!

ছকুরাম জিগোস করল, 'কিসের ভাবনা ধনপতজি?'

কি যেন চিন্তা করে ধনপত বলল, 'দু মাহিনা হ'ল—'

তার কথা শেষ হবার আগেই উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। চমকে তার দিকে তাকাল ছকুরাম।

কোমরে জলের গাগরা। পরনে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি আর লাল রঙের খাটো আঙিয়া। মেয়েটির স্বাস্থ্য যেমন বন্য তেমনি প্রচুর। এত প্রচুর, যে সবুজ শাড়ি আর খাটো আঙিয়াটা তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কেমন অশ্লীল মনে হয়।

মেয়েটার শক্ত শক্ত বলিষ্ঠ হাতে গোছা গোছা গালার চুড়ি। নাকে ঝুটা পাথর বসানো নথ। দুই ভুরুর মাঝখানে কাঁচপোকার টিপ।

কত বয়স হবে? খুব জোর আঠারো। আঠারো বছরের ঢল মেয়েটি ছাপাছাপি করে ভরে দিয়েছে। বর্ষার নদীর মত তার দেহ এখন অথৈ, অকূল।

পুরু পুরু দুটি ঠোঁট। সেই ঠোঁটের ফাঁকে অচেতন একটু হাসি আটকে আছে। নাকটি ধারালো। কোমরটি ভারি সরু, মনে হয়, হাতের মুঠোর মধ্যে বেড় পাওয়া যাবে। ঘাড়টি সুঠাম। আর গায়ের রঙ?

সবচেয়ে আশ্চর্য হল, এই রঙটি। চলতি অর্থে সে কালো। তার এই কালো রঙটি ভারি স্নিগ্ধ, ভারি কোমল।

মধ্যপ্রদেশের এই নীরস মাটিতে যেখানে অসহ্য রোদে সমস্ত মানুষ তামাটে আর কর্কশ হয়ে আছে, সেখানে শ্যামরূপের এই মেয়েটিকে অভাবিত মনে হয়।

দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বেলাশেষের নিস্তেজ আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই মুহূর্তে একটা সর্বনাশা যাদুকরীর মত মনে হচ্ছে তাকে।

একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে ছকুরাম। চোখ আর ফেরাতে পাচ্ছে না।

মেয়েটিও ছকুরামের দিকে চেয়ে রয়েছে। কালো পালকে ঘেরা বড় বড় দু'টি চোখ। সে চোখে তীব্রতা নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, শুধু বিচিত্র একটু কৌতূহল ফুটে আছে।

হঠাৎ পাশ থেকে ধনপত ডাকল, 'ছকুয়া—'

ছকুরাম চমকে উঠল। মেয়েটির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'কী বলছ?'

'তুমহাকে আমার ভাবনার কথা বলছিলাম না—'

'হাঁ।'

মেয়েটিকে দেখিয়ে ফিসফিস করল ধনপত, 'এই আমার ভাবনা—'

'এই তুমহার ভাবনা!' অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল ছকুরাম।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ধনপত।

ওদিকে মেয়েটিও চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। জলের গাগরা নিয়ে এবার সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে মনে মনে কি যেন আন্দাজ করে নিয়েছে ছকুরাম। তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটেছে। হঠাৎ সে ডাকল, 'ধনপতজি—'

'হ্যাঁ—' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ধনপত।

'এ কৌন? তুমহার নঈ ঘরওয়ালী (বউ) নাকি?'

ধনপত যেন আঁতকে উঠল। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল, 'আরে না না, ও ঘরওয়ালী হতে যাবে কেন? এ বয়সে কেউ ঘরওয়ালী আনে? ছিঃ ছিঃ—'

'তবে এ কৌন?'

'ও তো তিলিয়া।'

'তিলিয়া কৌন?'

'আমার বিটিয়া।'

'তুমহার বিটিয়া, কী বলছ!' অবিশ্বাসী চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল ছকুরাম! তারপর বলল, সারা জীওন তো শাদিই করলে না, বিটিয়া পেলে কুথায়?'

'তিলিয়া আমার ধরমবিটিয়া—'

আর কিছু শুধলো না ছকুরাম। তিলিয়া নামের এই মেয়েটি ধনপতের ধরমবেটি, এটুকু জেনেই সে খুশী। মেয়েটি সম্বন্ধে তার মনে আর কোন কৌতূহল নেই।

চার

এইমাত্র দিনটা অন্ধ হয়ে গেল।

রোদ নিভে গেছে। যতদূর তাকানো যায়, চারপাশ আবছা। এখন সন্ধে হয়-হয়।

পুব দিকে বস্তার জেলার শালবন। সেখান থেকে বাতাস ছুটে আসছে। সবেমাত্র অঘ্রাণ মাস পড়েছে। এরই মধ্যে বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে। শীতের আমেজ-লাগা শালবনের এই বাতাসটুকু ভারি মিঠে, ভারি সুখকর।

দাওয়ার ওপর এখনও চুপচাপ বসে আছে দু-জনে। দু-জনে অর্থাৎ ধনপত আর ছকুরাম। কেউ কথা বলছে না।

উঠানের মাঝখানে টাট্টুটা ছোলা চিবুচ্ছে।

একসময় হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ল ছকুরাম। উঠতে উঠতে বলল, 'যাই, টাট্টুটাকে খোপরির ভেতর রেখে আসি।'

এখন সন্ধে। রাত একটু গাঢ় হলেই বাঘের আনাগোনা শুরু হবে, কাজেই টাট্টুটাকে বাইরে রাখা আদৌ নিরাপদ নয়।

পাশাপাশি তিনখানা ঘর। পশ্চিম দিকের শেষ ঘরখানায় ধনপতের মোষেরা থাকে।

মোষের ঘরে টাট্টুটাকে রেখে ধনপতের কাছে ফিরে এল ছকুরাম।

চোখ বুজে কি যেন ভাবছিল ধনপত। ছকুরাম ডাকল, 'ধনপতজি—'

ধনপত সাড়া দিল।

ছকুরাম শুধলো, 'তুমহাদের এদিকে এবার ধান কেমন হয়েছে?'

'ভাল না।'

'ভাল না তো বুঝলাম। তবু কেমন?'

'আগের সাল যেমন হয়েছিল, মালুম হচ্ছে এবার তার আধাআধিও হবে না।'

'বল কি!' ছকুরামের গলা কেঁপে উঠল।

ধনপত বলতে লাগল, 'ভাল ধান হবে কুথা থেকে! এবারকি ভাল বারীশ (বর্ষা) হয়েছে! রোদে ক্ষেতিকে ক্ষেতি জ্বলে গেছে।'

'তা হলে—'

'তা হলে কী?'

শুকনো গলায় ছকুরাম বলল, 'ধান ভালো না হ'লে আদায়-উসুল হবে কেমন করে?'

ধনপত জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

ছকুরামের যা ব্যবসা তার সঙ্গে ধানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তার সুদের কারবার। মধ্যপ্রদেশের গঞ্জে গঞ্জে চড়া সুদে টাকা খাটিয়ে বেড়ায় সে।

ছকুরামের খাতকদের মধ্যে বেশির ভাগই আদিবাসী আর কৃষাণ। ধানের ফলন ভাল না হ'লে এই মানুষগুলির পক্ষে সুদের টাকা দেওয়া অসাধ্য হয়ে পড়ে।

এবার ভাল ধান হয়নি। শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে ছকুরাম। আস্তে আস্তে সে বলল, 'পিছু সাল এত ভাল ধান হয়েছিল। তাতেই শালেলোগদের কাছ থেকে সুদ আদায় করতে

জান নিকলে গেছে। এবার যে কি হবে—'

ধনপত বলল, 'যা হবার হবে। তার জন্য ভেবে কি করবে বল।'

মনে মনে কি যেন স্থির করে নিল ছকুরাম। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, 'ঠিকই বলেছ ধনপতজি। ভেবে কুছু ফায়দা (লাভ) নেই।'

ছকুরাম কী বলতে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারল না ধনপত। বিমূঢ় চোখে সে তাকিয়ে রইল।

ছকুরাম বলতে লাগল, 'ধান ভাল হোক মোন্দ হোক, আর নাই হোক, তাতে আমার কী? পাওনা আদায় করা নিয়ে আমার কথা। কি বল—'

ধনপতের গলায় অস্ফুট শব্দ ফুটল, 'লেকেন—'

'কী?'

'এ সাল ফসলের যা অবস্থা তা থেকে তুমহার সুদ দিতে হ'লে কিষাণলোগ স্রিফ মরে যাবে।'

খুব ঠাণ্ডা গলায় ছকুরাম বলল, 'মরলে আমি আর কি করতে পারি।'

ধনপত আর কিছু বলল না। বলে লাভও নেই। দশ বছর ধরে ছকুরাম নামে সুদজীবী এই মানুষটাকে দেখছে সে। ছকুরাম-চরিত্রের সবটুকু মাহাত্ম্যই তার জানা হয়ে গেছে।

ধ্যান বল, জ্ঞান বল—সুদই এই লোকটার সব কিছু। দিবারাত্রি ঐ এক চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে সে।

সুদের জন্য এই মৈথিলী ব্রাহ্মণটা না পারে হেন কাজ নেই। জগৎ-সংসারে যত রকমের নির্যাতন আছে—দরকারমত তার সবগুলোই খাতকের ওপর প্রয়োগ করে থাকে সে। আসল কথা, যেমন করে হোক সুদ তার চাই-ই। পাওনা আদায়ের পর খাতক বেঁচে রইল না মরে গেল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও থাকে না।

ধনপত তার ষাট বছরের জীবনে ছকুরামের মত এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর একটাও দেখে নি।

পাঁচ

ছকুরাম মানুষটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি হৃদয়হীন। খাতকরাই শুধু না, যে কেউ ছকুরামের সংস্রবে আসুক না, তার হৃদয়হীনতার পরিচয় পাবেই। দশ বছর ধরে ধনপতও পেয়ে আসছে।

দশ বছর আগে তাদের প্রথম আলাপ।

প্রথম আলাপের খুঁটিনাটি সব হুবহু মনে রেখেছে ধনপত। মনে রাখার কারণও আছে। কারণ, সেই তখন থেকেই ছকুরামের হৃদয়হীনতা শুরু হয়েছে।

মনে পড়ে সেটা ছিল অঘ্রানের মাঝামাঝি একটা দিন। সময়টা ছিল দুপুর। সূর্যটা ছিল মাথার ওপরে। অসহ্য রোদে আকাশটা ঝলসে যাচ্ছিল।

(তখন এদিকে নতুন ধান উঠেছে। মরসুম শুরু হয়ে গেছে।)

নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে আয়েস করে 'চুট্টা' (এক ধরনের বিড়ি) ফুঁকছিল ধনপত। আর নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছিল।

ঠিক সেই সময় সামনের লাল ধুলোর রাস্তায় একটা টাঙা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল ধনপত।

সওয়ারী ছিল মাত্র একজন। সেই-ই টাঙাটা হাঁকিয়ে এনেছে। তার বয়স খুব বেশি হলে বিশ কি বাইশ। এর আগে আর কোনদিনই এই লোকটাকে দেখে নি ধনপত। 'লোক' তাকে ঠিক বলা যায় না। ছেলে বললেই যেন মানায়। গালে অল্প অল্প দাড়ি। রোদে পুড়ে দাড়িগুলো তামাটে হয়ে গেছে। এত কম বয়স তবু ছেলেটার মুখ অদ্ভুত চোয়াড়ে। চোখ দুটো অসম্ভব রুক্ষ। ছেলেটা শুধিয়েছিল, 'ইধর ধনপত বুড়্‌ঢা কুথায় থাকে?'

অবাক হয়ে গিয়েছিল ধনপত। অপরিচিত একটা লোকের মুখে

নিজের নাম শুনলে অবাক হওয়ারই কথা।

ছেলেটা আবার বলেছিল, 'ধনপত বুড্ঢার কোঠিটা এট্টু দেখিয়ে দেবে—'

এবার ধনপত বলেছিল, 'আমিই ধনপত—'

'তুমিই ধনপত। তবে তো ভালই হ'ল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল না।'

'লেকেন—'

'কী?'

'তুমি কৌন? আমার কাছে তুমহার কী দরকার?'

'বলব, সব বলব। আগে তুমহার কোঠিতে চল। এখানে বড় ধূপ (রোদ)।'

এতক্ষণ খেয়াল করে নি ধনপত। গনগনে রোদে ছেলেটার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত দেখাচ্ছে তাকে।

খেয়াল হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ধনপত, 'আরে আও আও, উতারকে আও—'

টাঙা থেকে নেমে এসেছিল ছেলেটা। তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠেছিল ধনপত।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে ছেলেটা শুরু করেছিল, 'আমার নাম ছকুরাম মিশির। আজ আমি আভনপুর এসেছি। ওখানে কারবার করব, ঠিক করেছি।'

'কিসের কারবার?' ধনপত জিগ্যেস করেছিল।

'সুদের।'

একটু চুপ।

ছকুরাম আবার বলেছিল, 'এই পয়লা আমি এদিকে আসছি। এসে মুশকিলে পড়ে গেছি।'

'কিসের মুশকিল?'

মুশকিল যে কী, এরপর বুঝিয়ে বলেছিল ছকুরাম। মুশকিলটা

হ'ল মাথা গোঁজার একটা আস্তানা নিয়ে।

আভনপুরের গঞ্জে ব্যবসা করবে ঠিক করেছে সে। ব্যবসার খাতিরে পুরো মরসুমটা তার সেখানে থাকা দরকার। কিন্তু থাকার মত কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই।

অবশ্য সারি সারি হাটের চালা আছে আভনপুরে। চালাগুলোর চারপাশে কিছু নেই। মাথার ওপর যৎসামান্য ছাউনি। এদিকটায় এত শীত আর বাঘের এত উপদ্রব যাতে হাটের চালায় রাতকাটানো কোনমতেই সম্ভব না।

কাজেই একটা আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে ছকুরাম। প্রথমে আভনপুরের আশেপাশে খোঁজ করেছে। সেখানে গ্রাম নেই, গৃহস্থ নেই। কে-ই বা তাকে আশ্রয় দেবে!

খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত গোরীগাঁও-এ এসেছে সে। এখানে এসে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। কিন্তু কোথাও ঠাঁই মেলে নি। এখানে সব বাড়িতেই মানুষের তুলনায় ঘর কম। এত কম, যাতে বাড়তি একটা লোককে জায়গা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

নিরাশ হয়ে ছকুরাম যখন চলে যাবে ঠিক করেছে, সেই সময় গ্রামেরই একটা লোক তাকে হদিস দিয়েছে, 'ধনপত বুড্‌ঢার কাছে যাও। সে একা আদমী আর তার কোঠিতে তিনটে ঘর। মালুম হচ্ছে, তার ওখানে সুবিস্তা (সুবিধা) হবে।'

আশায় আশায় ধনপতের ডেরায় এসেছে সে।

ছকুরাম বলেছিল, 'মরসুমের সময়টা তুমহার এখানে থাকতে চাই।'

'হাঁ-হাঁ জরুর।'

এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল ধনপত। বলেছিল, 'আমার কোঠি তো খালি পড়ে আছে। থাকো না।'

প্রথম দেখেই ছকুরামকে খুব ভাল লেগেছিল তার। অবাক অপলক চোখে বার বার ধনপত তাকে দেখছিল। দেখতে দেখতে কেমন যেন আকর্ষণ বোধ করছিল।

এবার ছকুরাম বলেছিল, 'একটা কথা ধনপতজি—'

'কী ?'

'তুমহার এখানে তো থাকব—'

'হাঁ।'

'ঘর ভাড়া কত দিতে হবে ?'

একটা লোক কয়েকটা দিন তার বাড়ি থাকবে, সে জন্য ভাড়া দিতে চাইছে। এমন একটা অদ্ভুত কথা আগে আর কোনদিনই শোনে নি ধনপত। তা ছাড়া মধ্যপ্রদেশের এই গ্রামে বাড়িভাড়া দেওয়ার রেওয়াজ নেই।

আস্তে আস্তে ধনপত বলেছিল, 'ভাড়া !' তার গলায় বিস্ময় ফুটেছিল।

'হাঁ—' ছকুরাম শুধিয়েছিল, 'বল, কত লাগবে ?'

'না না, কুছু লাগবে না।' জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল ধনপত।

'বিনা ভাড়ায় থাকতে দিতে চাইছ ?'

'হাঁ।'

'কেন ?'

'কেন আবার। আমার এখানে থাকলে তুমহার যদি এটু, উপকার হয়—'

ধনপতের কথা শেষ হবার আগেই ছকুরাম চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'উপকার ! কোন শালের কাছ থেকে অ্যায়সা অ্যায়সা উপকার আমি নিই না। কিছু নিলে আমি তার কিমত (দাম) দি।'

একটু থেমে আবার বলেছিল, 'ভাড়া তুমহাকে নিতেই হবে ধনপতজি।'

কী জবাব দেবে ভেবে পায় নি ধনপত।

শাদি করে সে যদি ঘর-সংসার করত, ছকুরামের বয়সী একটা ছেলে থাকা অসম্ভব হ'ত না।

ছেলের বয়সী একটা লোককে ক'টা দিন নিজের বাড়িতে আশ্রয়

দিয়ে ভাড়া নিতে হবে, ভাবতেই খুব খারাপ লাগছিল ধনপতের। তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

কি একটু ভেবে একসময় ধনপত বলেছিল, 'ভাড়া তো নিতে বলছ। লেকেন—'

'লেকেন কী?' ছকুরাম তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল।

'একটা কথা ভেবে ছাখ।'

'কী?'

'তুমি যদি কোন আপন জনের বাড়ি উঠতে, ভাড়া দিতে পারতে?'

'ছুনিয়ায় আমার কোন আপন জন নেই।'

'কেউ না থাকে আমাকেই ধরে নাও না।' ধনপতের গলায় অন্তরঙ্গতা ফুটেছিল।

তীব্র সন্দিগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ছকুরাম। তারপর শাণিত গলায় বলেছিল, 'তুমহাকে আমার আপন জন ধরে নেব? কী বলছ ধনপতজি! কী মতলব তুমহার!'

ধনপত জবাব দেয় নি। কেমন করে সে বোঝাবে, শুধুমাত্র আন্তরিকতা ছাড়া তার মনে অন্য কোন অভিসন্ধি নেই।

ধনপতের দিক থেকে যতই আন্তরিকতা থাক, দু-হাত বাড়িয়ে যতই সে কাছে টানতে চাক, ছকুরাম কিন্তু ধরা দেয় নি। রুক্ষ, কর্কশ গলায় আবার সে বলেছিল, 'কুটুম্বিতা করতে তুমহার কাছে আসি নি। একটা সিধা বাত শুনে রাখ ধনপতজি। দো মাহিনা তুমহার এখানে থাকব। তার জন্যে তিন রুপেয়া ভাড়া পাবে।'

এবার জবাব দেয় নি ধনপত। ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থেকেছে সে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছে, ছকুরাম নামে বিশ-বাইশ বছরের এই ছেলেটা কি অদ্ভুত নির্দয়।

প্রথম আলাপ থেকেই শুরু।

তারপর দশ বছর ধরে নানা ব্যাপারে ছকুরামের হৃদয়হীনতায় ক্ষুব্ধ

হয়ে আসছে ধনপত।

প্রতি বছর মরসুমের দুটো মাস ধনপতের বাড়ি এসে থেকে যায় ছকুরাম। থাকবেই শুধু। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তার নিজের।

বাৎসল্যের বশে কথনও যদি ধনপত কিছু খেতে দিয়েছে, খুবই বিরক্ত হয়েছে ছকুরাম। বলেছে, 'আচ্ছা ধনপতজি, একটা কথার জবাব দাও তো—'

'কী কথা ?' ধনপত জিগ্যেস করেছে।

'তুমহার এখানে থাকি, তার জন্যে ভাড়া দি। লেকেন খাওয়ার জন্যে কুছু দি কী ?'

'না।'

'তবে খেতে দিচ্ছ কেন ?'

থতমত খেয়ে ধনপত বলেছে, 'অ্যায়সাই। ইচ্ছা হল—'

'এমন ইচ্ছা ভাল না। তুমহার খাবার তুমি নিয়ে যাও!'

এতকাল এখানে যাওয়া-আসা করছে ছকুরাম। কিন্তু কোনদিনই তাকে কিছু খাওয়াতে পারে নি ধনপত।

একটা লোকের সঙ্গে দশ বছর মেলামেশা করলে তার কোন কথাই জানতে বাকি থাকে না। কিন্তু ছকুরামের জীবনের প্রায় সবটুকু ধনপতের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে।

ছকুরামের দেশ বিহারের চম্পারণ জেলা আর জাতে সে মৈথিলী ব্রাহ্মণ, দশ বছরে তার সম্বন্ধে মাত্র এইটুকুই জানতে পেরেছে ধনপত। এটুকু জেনেই তাকে খুশী থাকতে হয়েছে।

আন্তরিকতার বশে কথনও হয়ত ধনপত জিগ্যেস করেছে, 'আচ্ছা ছকুরাম, মুলুকে তুমহার কে কে আছে ?'

উদাসীন গলায় ছকুরাম বলেছে, 'কেউ না।'

'সচ বলছ!' একটু যেন আশ্চর্যই হয়েছে ধনপত, 'বাপ, মা, ভাই, বহিন—কেউ না!'

এবার রেগে উঠেছে ছকুরাম, 'কেউ থাক আর না-ই থাক, তুমহার তাতে কী ? কুছ্ দরকার আছে ?'

এরপর আর কোন প্রশ্ন করতে ধনপতের উৎসাহ হয় নি।

বিচিত্র মানুষ এই ছকুরাম।

বাৎসল্য, প্রীতি, স্নেহ—মানুষের মনে যত কোমল আর সুন্দর বৃত্তি আছে, ছকুরামের কাছে সে সব একেবারেই নিরর্থক।

ওর প্রাণের গভীরটা আশ্চর্য মৌন, আশ্চর্য শীতল। আন্তরিকতা মমতা—যা কিছু দিয়েই স্পর্শ করা যাক না, ছকুরামের প্রাণ কখনই সাড়া দেয় না। অন্তত ধনপতের তাই ধারণা।

ছয়

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

আজ শুক্লা দ্বাদশী। আকাশে গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে।

গোরীগাঁও-এর চারপাশে লালমাটির সীমাহীন প্রান্তর। অসহ্য রোদে প্রান্তরগুলো সারাদিন পুড়েছে। এখন দ্বাদশীর চাঁদ তাদের সব দাহ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

সবেমাত্র অঘ্রান মাস। এরই মধ্যে হিম পড়তে শুরু করেছে। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। বাতাস আর হিমের গতিক দেখে মনে হচ্ছে, শীতটা এবার যেন তাড়াতাড়িই পড়বে।

সন্ধের একটু আগে চান করে দাওয়ায় এসে ধনপতের পাশাপাশি বসেছিল ছকুরাম। এখনও বসেই আছে তারা।

হঠাৎ ধনপত বলল, 'ঘরে চল ছকুয়া—'

'চল—'বলেই উঠে পড়ল ছকুরাম।

পাশাপাশি তিনখানা ঘর। মাঝখানের ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল দুজনে। এককোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের আলোটা এত মৃদু আর এত নিস্তেজ যাতে কিছুই স্পষ্ট নয়। ঘরের ভেতরটা কেমন

আবছা আর রহস্যময়।

যত আবছাই হোক তবু বোঝা যাচ্ছে একপাশে একটা দড়ির খাটিয়া, আরেক পাশে স্তূপাকার মালপত্র। মালপত্রগুলো অবশ্য ছকুরামের। আজ বিকেলেই সেগুলো নিয়ে এসেছে সে।

ধনপত বলল, 'তুমহার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে ছকুরাম?'

'কি আবার হবে।' ছকুরাম বলল, 'রোটি ঔর আলুর ছোকা বানিয়ে নেব।'

প্রতি বছর এখানে আসার সময় আটা-ডাল-ঘি-নুন—নিজের খোরাকির মত সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসে ছকুরাম। শুধু খাবারই না, একটা উনুন, কিছু লকড়ি আর রুটি সেঁকার চাটুটি পর্যন্ত বাদ যায় না। নিজের রান্না সে নিজেই করে নেয়।

ধনপতের একবার ইচ্ছে হল ছকুরামকে বলে, 'অনেকখানি পথ টাঙা হাঁকিয়ে এসেছ, হয়রান হয়ে পড়েছ। আজ আর রোটি পাকাবার ঝামেলা ক'রো না। আমাদের যা খাবার আছে, এসো ভাগজোগ করে খাই।' ইচ্ছাটা কিন্তু মনের মধ্যেই থেকে গেল। মুখ ফুটে বলতে পারল না ধনপত। বলে লাভও নেই। সে জানে যত অনুরোধই করা হোক, ছকুরাম খাবে না।

অগত্যা ধনপত বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। তাড়াতাড়ি রোটি বানিয়ে নাও ছকুয়া।'

'নিচ্ছি—'

ঘরের কোণের মালপত্রগুলোর ভেতর থেকে আটা-নুন-উনুন-লকড়ি—দরকারমত সব কিছু বার করে নিল ছকুরাম। তারপর কুয়া থেকে লোটায় করে জল এনে আটা মাখতে বসল।

পাশে বসে দেখতে লাগল ধনপত।

বাইরে অঘ্রানের বাতাস মাতামাতি করছে।

একসময় আটা মাখা হয়ে গেল। এখন গোল গোল করে ডেলা পাকাচ্ছে ছকুরাম।

ধনপত ডাকল, 'ছকুয়া—'

'বল—'ছকুরাম মুখ তুলল।

একটু ইতস্তত করল ধনপত। একবার ছকুরামের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিল। আবার তাকিয়ে ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল' 'তুমহাকে একটা কথা বলব।'

'কী?'

'এই তিলিয়ার কথা।'

'তিলিয়া—' ছকুরামের গলায় অস্ফুট শব্দ ফুটল।

'হাঁ-হাঁ তিলিয়া, আমার ধরমবিটিয়া। আজ বিকেলে তাকে দেখলে না?'

ছকুরাম জবাব দিল না।

ধনপত থামে নি, 'তিলিয়াকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি ছকুয়া। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

এবারও চুপ করে রইল ছকুরাম।

ধনপত বলতে লাগল, 'মেয়েটার সব কথা তুমহাকে বলছি। সব শুনে একটা পরামর্শ দাও।'

এতক্ষণে মুখ খুলল ছকুরাম! নিরাসক্ত স্বরে বলল, 'তুমহার ধরমবিটিয়ার কথা শুনে আমার ফায়দা (লাভ) নেই। পরামর্শও আমি দিতে পারব না।'

ধনপত আর কিছু বলল না। ক্ষুব্ধ মুখে বসে রইল।

ছকুরামের সঙ্গে দশ বছর ধরে তার মেলামেশা। কিন্তু আশ্চর্য! কোন দিনই কোন ব্যাপারে তার কাছ থেকে পরামর্শ চেয়ে পায় নি ধনপত।

পৃথিবীতে একসঙ্গে বাস করতে হ'লে একজনকে আরেকজনের সুখ-দুঃখ, এমন কি ভাবনা-চিন্তারও অংশীদার হতে হয়। সমাজবদ্ধ জীবনে এই হ'ল নিয়ম। কিন্তু সমাজের কোন নিয়মেরই ধার ধারে না ছকুরাম।

মানুষ হিসেবে ছকুরাম শুধু নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীনই না, অসামাজিকও।

সাত

পরের দিন টাঙা হাঁকিয়ে আভনপুরের গঞ্জে এল ছকুরাম।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। ঠিকমত রোদ ওঠে নি। পুবদিকের আকাশে সবেমাত্র লাল ছোপ ধরেছে।

এরই মধ্যে বিকিকিনি শুরু হয়ে গেছে। দরাদরি আর হাঁকা হাঁকিতে আভনপুর গম গম করছে।

গঞ্জের পশ্চিম দিকে একটা ছোট নদী যার নাম বত্তিয়া। বত্তিয়া পাহাড়ী নদী। চাঁই চাঁই কালো পাথর আর অসংখ্য নুড়ির ওপর দিয়ে নীল রঙের জল লাফিয়ে চলেছে। একটানা কল কল শব্দ হচ্ছে।

দূর থেকে শুনলে মনে হয়, এই অঘ্রান মাসে নদীটায় বুঝি বা ঢল নেমেছে। কিন্তু তা নয়। পাহাড়ী নদীর স্বভাবই এই। তার শীত গ্রীষ্ম নেই, অঘ্রান-পৌষ নেই। বছরের সব সময় সব ঋতুতেই তার ঢল-নামা অস্থিরতা।

কোন পাহাড়ের বুক চিরে যে বত্তিয়া নেমে এসেছে সে সন্ধান কারো জানা নেই। পুবদিকে যে শালবন রয়েছে, তার ওপারে আদিবাসী মারিয়াদের গ্রাম। মারিয়াদের গ্রামের পর একটা বেঁটে চেহারার অতি বৃদ্ধ পাহাড় আছে। লোকের অনুমান, বত্তিয়া সেখান থেকেই আসছে।

বত্তিয়ার পার ঘেঁসে সারবন্দি হাটের চালা। টাঙা নিয়ে সোজা চালাগুলোর দিকে চলল ছকুরাম।

ছকুরাম দেখে আভনপুরের গঞ্জটা সচকিত হয়ে উঠল। চার পাশে চাপা সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুরু হ'ল।

'ছকুয়াজি আ গিয়া—'

'ছকুয়াজি আ গিয়া—'

গুঞ্জনটা গ্রাহ্যই করল না ছকুরাম।

পশ্চিমদিকের শেষ প্রান্তে বত্তিয়া নদীর পারে প্রকাণ্ড একটা

টিলা। টিলাটার ঠিক নীচেই যে ত্রিভঙ্গ চালাটা চারটে দুর্বল পায়ে কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে, তার সামনে এসে টাঙা থামাল সে।

এই চালাটা প্রতি বছর ছকুরামের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। মরসুমের সময় এখানে এসে সে এটা দখল করে।

সঙ্গে করে গুটিকয়েক চট এনেছিল ছকুরাম টাঙা থেকে সেগুলো নামিয়ে চালাটায় বিছিয়ে নিল। তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

এখন রোদ উঠে গেছে। অঘ্রান মাসের তীব্র শাণিত রোদ বাতাস গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

মধ্যপ্রদেশে প্রকৃতির লীলা বড় বিচিত্র. দিনের বেলা অসহ্য রোদ, রাত্তিরে নিদারুণ শীত।

নিজের চালাটায় বসে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে ছকুরাম। অন্য বছরের মত এবারও সবাই এসেছে। মারাঠী শেঠ ভীমাজরাও বীরকর এসেছে। কাশ্মীরী শেঠ শিউপুরী এসেছে। পাঞ্জাবী শেঠিনী বিরজা এসেছে। আর এসেছে মারোয়াড়ি এবং গুজরাতি বেনিয়ার দল। হাটের চালায় চালায় তারা দোকান সাজিয়ে বসেছে।

শুধু ভিনদেশী শেঠেরাই না, স্থানীয় লোকেরাও দোকানদারি করতে বসেছে। তাদের আয়োজন অবশ্য খুবই সামান্য. কেউ ধানচাল নিয়ে বসেছে। কেউ অল্পসল্প আনাজ। কেউ হাঁস-মুরগি-ডিম কেউ বা মৃগনাভি-বাঘছাল-হরিণের শিঙ—এমনি নানান জিনিস.

স্থানীয়দের মধ্যে বেশির ভাগই আদিবাসী মেয়েমানুষ. তাদের বিভিন্ন জাত। কেউ মারিয়া, কেউ পরজা, কেউ হালবা, কেউ বা ধুরুয়া।

মেয়েগুলোর উদ্দাম স্বাস্থ্য। এত উদ্দাম যে বয়স বোঝা যায় না। মধ্যপ্রদেশের এই আদিম মানবীরা বয়সটাকে যেন জাদু করে রেখেছে। নিজেদের শরীরের কোথাও এতটুকু দাগ কাটতে দেয় নি।

স্বাস্থ্যই শুধু উদ্দাম নয়, প্রাণাবেগও তাদের অপরিমিত। ক্ষণে তারা হাসছে, ক্ষণে ঢলছে, ক্ষণে মেতে উঠছে। অকারণে প্রমত্ত, অনায়াসে উচ্ছ্বসিত হতে তারা জানে।

মেয়েগুলোর গায়ে জামা নেই। পরনে একটা করে মাত্র লাল রঙের খাটো শাড়ি। এত খাটো যে তাদের স্বাস্থ্যের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। কতকগুলো প্রখর রেখা ফুটিয়ে শাড়িগুলো তাদের শরীরের সব রহস্য স্পষ্ট করে দিয়েছে।

শাড়িগুলো তাদের কী হাল করেছে, সে সম্বন্ধে মেয়েগুলোর কোন হুঁশই নেই। হুঁশ নেই, কাজেই সঙ্কোচও নেই।

মেয়েগুলোর পরনে লাল শাড়ি, চুলে লাল ফুল, গলায় লাল কুঁচের মালা। লাল রঙটার প্রতি তাদের বিচিত্র আকর্ষণ। নিজের চালায় বসে আদিবাসিনী মেয়েদের শরীরের বাহার দেখছিল না ছকুরাম। কাকে যেন খুঁজছিল। অনেকক্ষণ থেকেই খুঁজছিল।

হঠাৎ পাশ থেকে চাপা ভোঁতা গলায় কে ডেকে উঠল, 'ছকুয়াজি—'

চমকে ঘুরে বসল ছকুরাম। দেখল, এতক্ষণ যাকে খুঁজছিল সেই লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে। খাড়া খাড়া চুলগুলো লালচে। চুলই শুধু নয়, দাড়ি ভুরু এবং গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত লাল। মধ্যপ্রদেশের লাল মাটির ছাপ তার সর্বাঙ্গে।

সাধারণ মাপের মানুষের তুলনায় লোকটা অনেক বড়। লম্বায় প্রায় সাড়ে চার হাত। সমস্ত শরীরে ড্যালা ড্যালা পেশী। ঘাড়ের ওপর অনাবশ্যক খানিকটা মাংস ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে হাত দুটো জানু পর্যন্ত এসেছে।

লোকটার নাক থ্যাবড়া, চোয়াল দুটো খাড়া, মুখ রেখাবর্জিত, ঠোঁট শক্তবদ্ধ। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল তার চোখ। হঠাৎ দেখলে ভাবলেশহীন মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই আপাত ভাবলেশহীনতার গভীরে কোথায় যেন সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে রয়েছে।

হাত-পা-মুখ-চোখ আর ঘাড়ের সেই ঢিবি—সব মিলিয়ে লোকটা যেন পুরোপুরি মানুষ না। অর্ধপশুগঠন একটা জন্তুর মত। মূঢ় আর অবোধ একটা জানোয়ার যেন।

পরনে তার নোংরা একটি নেংটি। এত নোংরা যে নখ দিয়ে খুঁটলে ময়লা উঠে আসে। এই নেংটিটা ছাড়া তার গায়ে আচ্ছাদনের আর কোন বালাই নেই।

মধ্যপ্রদেশের শালবনে আর পাহাড়ে পাহাড়ে যে আদিম মানুষেরা ছড়িয়ে আছে, এই লোকটা তাদেরই একজন। নাম তার ফিতুর্। জাতে সে মারিয়া।

ফিতুর্ নামে এই আদিবাসী মারিয়াটার সঙ্গে ছকুরামের একটা সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা এইরকম।

প্রতি বছর এখানে সুদের কারবার করতে আসে ছকুরাম। সুদের কারবারের অনেক বিপদ।

ছকুরাম জানে, খাতকদের টাকা ধার দেওয়া যত সহজ, আদায় করা তেমনি দুরূহ। সুদের টাকা চাইলেই তাদের টালবাহানা শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে, 'ধানটা ভাল হয়নি, কুথা থেকে তুমহার রুপেয়া দোব।' কেউ বলে 'এই সালটা মাপ করে দাও ছকুয়াজি।' আবার এমন খাতকও আছে, টাকা চাইলেই যারা মারমুখো হয়ে ওঠে।

কাজে কাজেই অনেক খুঁজে ফিতুর্কে বার করেছে ছকুরাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে সুদ আদায় করতে বার হয় সে।

জান্তব চেহারার এই লোকটাকে নিয়ে ছকুরাম যখন খাতকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, মন্ত্রের মত কাজ হয়ে যায়। একটা কথাও বলতে হয় না। আপনা থেকেই খাতক তার পাওনা মিটিয়ে দেয়।

ফিতুর্ লোকটা যেমন বিশ্বস্ত তেমনি অনুগত। তার আনুগত্য পালিত পশুর মত। ছকুরামের মুখ থেকে হুকুম খসার সঙ্গে সঙ্গে সে তামিল করে বসে। যে হুকুমটা সে তামিল করল সেটা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় সে সম্বন্ধে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

আসল কথা, কোন বিষয়েই ফির্তুর বিচার নেই, বিবেচনা নেই। এমন কি স্বাধীন একটা ইচ্ছা পর্যন্ত না। ছকুরাম যখন যা বলে, বিনা দ্বিধায় সে তা করে যায়।

ফির্তু যেন অমোঘ একটা অস্ত্র। দশ বছর ধরে সুদ আদায়ের ব্যাপারে এই অস্ত্রটিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে আসছে ছকুরাম।

অবশ্য এমনি এমনি খাটে না ফির্তু। প্রতি মরসুম কাজের বাবদ ছকুরামের কাছ থেকে পাঁচটি করে টাকা আর খোরাকি পায় সে।

ফির্তু আভনপুরের বাসিন্দা নয়। এমন কি কাছাকাছিও সে থাকে না। এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে বস্তার জেলার শেষ মাথায় মারিয়াদের একটা গ্রাম আছে। নাম চারামা।

ফির্তু চারামা গ্রামের লোক। তার সঙ্গে কথা আছে, মরসুম পড়লেই আভনপুর চ'লে আসবে। ছকুরাম যতদিন না আসে, অপেক্ষা করতে থাকবে। দশ বছর ধরে এই নিয়মেই চলে আসছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ফির্তু।

ছকুরাম ডাকল, 'অন্দর আয়।'

নিঃশব্দে চালার ভেতর গিয়ে বসল ফির্তু।

ছকুরাম শুধলো, 'চারামা থেকে কবে এসেছিস?'

'তিন রোজ হ'ল।' ফির্তু বলল।

'তিন রোজ!'

'হাঁ—'

একটু চুপচাপ।

নিজের মনে কি যেন ভেবে নিল ছকুরাম। তারপর বলল, 'তিন রোজ তো এখানেই আছিস, কি রে?'

'হাঁ—' জোরে জোরে মাথা নাড়ল ফির্তু।

'তা খেয়াল রেখেছিস?'

'কিসের?'

'কিসের আবার, শালেলোগরা আসছে কি না—'

'শালেলোগ' বলতে বুঝতেই পারল ফির্তু। দশ বছর ধরে

ছকুরামকে এই শব্দটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে শুনছে সে।

'শালেলোগ' অর্থাৎ খাতকেরা। খাতকদের সম্বন্ধে এই শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করে ছকুরাম যাতে তার প্রাণের সবটুকু বিতৃষ্ণা মিশে থাকে। যে খাতকেরা সুদ দিয়ে তার কারবারটাকে দিন দিন ফাঁপিয়ে তুলছে, তাদের প্রতি কেন তার এত বিরাগ, কে বলবে।

ছকুরামের খাতকদের সবাইকেই চেনে ফিতু। আস্তে আস্তে সে বলল, 'হাঁ, উ লোগন তো আসছে।'

খাতকরা যে আসছে এবং সবাই এখনও না এসে থাকলে দু-চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বে, সে সম্বন্ধে ছকুরাম নিঃসংশয়। আভনপুরে না এসে তাদের উপায় নেই। এ তল্লাটে এই একটাই মাত্র গঞ্জ আর সারা বছরের একটাই মরসুম। মরসুমের সময় আভনপুর না এলে তাদের ফসল বিক্রী হবে না। ফসল বিক্রী না হ'লে হাতে টাকা আসবে না।

ফসল বেচে টাকা করবার জন্যই শুধু তারা এখানে আসে না। অন্য দরকারেও তাদের আসতে হয়।

আশেপাশে ষাট-সত্তর মাইলের মধ্যে দোকান-পসার নেই। কাজেই মরসুমের সময় আভনপুর থেকে জামা-কাপড়-তেল-নুন—সারা বছরের মত যাবতীয় জিনিস কিনে রাখতে হয়।

এ সময়টা এখানে এলে সব খাতককেই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

পাশ থেকে ফিতু আবার বলে উঠল, 'সবাই তো আসছে। লেকেন—'

'লেকেন কী?' তীক্ষ্ণ চোখে ছকুরাম তাকাল।

'উ আদমীটা ই সালও এল না।'

'কৌন আদমীটা?'

'রাজুয়া—'

'রাজুয়া শালে এবারও আসে নি?'

'নহি।'

দাঁতে দাঁত চাপল ছকুরাম। তার মুখটা কেমন যেন হিংস্র

হয়ে উঠল। চাপা উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'কুত্তাটা দো সাল এদিকে আসছে না।'

ফিতু´ কিছু বলল না।

চুপচাপ খানিকটা সময় কেটে গেল।

অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল ছকুরাম। তারপর বলল, 'রাজুয়ার ব্যবস্থা পরে হবে। যে শালেরা এসেছে, তাদের একবার দেখে আসি। চল্ ফিতু´—'

ছকুরামের মুখ থেকে কথা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ফিতু´ উঠে পড়ল।

দু-পাশে হাটের চালা। মাঝখান দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তা। এত ধুলো, পা ফেললে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যায়।

ছকুরাম আগে আগে চলেছে। ফিতু´ পেছনে।

ফিতু´র চলাটা ভারি অদ্ভুত। ঘাড়ের সেই ঢিবিটার ভারে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে দুলে দুলে হাঁটে সে। তার হাঁটাটা একশ্রেণীর মানবেতর প্রাণীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

আভনপুর জায়গাটা আধা-পাহাড়ী আধা-সমতল। সমতলের দিকটা ধুলোয় ধুলোয় আচ্ছন্ন। পাহাড়ের দিকটায় শুধু চড়াই আর উতরাই। পথগুলো সেখানে আঁকাবাঁকা, 'গোলকধাঁধার মত।

সমতলের দিক থেকে পাহাড়ের দিকে এসে পড়ল দুজনে। একটা চড়াইয়ের চুড়োয় উঠতেই লছমনের সঙ্গে দেখা হ'ল।

লছমন লোকটা ছকুরামের দেনাদার। বছর তিনেক আগে পনেরটা টাকা কর্জ নিয়েছিল সে। এখনও শোধ করতে পারে নি। তাই বছর বছর ছকুরামকে দু-টাকা করে সুদ দিয়ে যাচ্ছে!

একটা টুকরিতে সামান্য কিছু জোয়ার নিয়ে বেচতে বসেছে লছমন ছকুরামকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

ছকুরাম বলল, 'আমি এসেছি লছমন—'

কাঁপা গলায় লছমন বলল, 'এ সালটা বড় মুশকিল ছকুয়াজি। থোড়ি ফসল হয়েছে।'

'তাতে কী হয়েছে ?'

'এ সালটা তুমহার পাওনা দিতে পারছি না।'

ছকুরাম কিছু বলল না। আস্তে আস্তে তার মুখে কতকগুলো নিষ্ঠুর রেখা ফুটে বেরুল। রেখাগুলো এতক্ষণ দেখা যায় নি। খুব সম্ভব মুখের চামড়ার নীচে গুপ্ত ছিল।

লছমন আবার বলল, 'এ সালটা মাফ করিয়ে দাও ছকুয়াজি। আগেলা সাল থেকে তুমহার সুদ ঠিক দিয়ে যাব।'

ছকুরাম বলল, 'মাফ হবে না।'

'লেকেন ছকুয়াজি—'লছমন প্রায় কেঁদে ফেলল, 'এ সাল তুমহাকে রুপেয়া দিতে হলে মরে যাব।'

ছকুরাম আর কিছু বলল না। পাশে-দাঁড়িয়ে-থাকা ফিতুর দিকে তাকাল। তার তাকানোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা ইশারা রয়েছে।

ফিতু যেন ওত পেতেই ছিল। ছকুরামের ইশারা পাওয়ামাত্র একটা শিকারী বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে লছমনের সামনে থেকে জোয়ারের টুকরিটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। টুকরিতে যা জোয়ার আছে, তার দাম প্রায় সাত-আট টাকা।

প্রাণফাটা একটা চিৎকার করে উঠল লছমন, 'মর যায়েগা ছকুয়াজি, মর যায়েগা। আমার জওয়ার দাও। দু-চার রোজ বাদ তুমহার পাওনা দিয়ে আসব।'

'সচ্ বলছ ?' নীরস গলায় শুধলো ছকুরাম।

'হাঁ হাঁ সচ্—'

এবার ফিতুর দিকে তাকিয়ে ছকুরাম বলল, 'টুকরিটা দিয়ে দে।'

জোয়ারের টুকরিটা নামিয়ে রাখল ফিতু।

এই হচ্ছে ছকুরামের টাকা আদায়ের পদ্ধতি। এইভাবেই খাতকদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করে থাকে সে।

ফিতু নামে মূঢ় পশুটাকে নিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে ছকুরাম।

লছমনের পর যে খাতকটিকে পাওয়া গেল তার নাম ডুমনো।

ডুমনোকে কিছুই বলতে হ'ল না। ছকুরামকে দেখে সে পনের সের ধান মেপে দিল। সুদ বাবদ ডুমনো টাকা দেয় না। টাকার বদলে ধান দেয়। প্রতি বছর পনের সের করে ধান।

ডুমনোর পর পাওয়া গেল লাখপতিয়াকে। লাখপতিয়ার পর মস্তা। মস্তার পর ছগনলাল। তারপর রতিয়া, কিষণ, কারমা—এমনি অনেক। সব মিলিয়ে দশজন।

সুদের বাবদ কেউ টাকা দিল। কেউ দিল ধান, কেউ জোয়ার, কেউ বা ভুট্টা। কেউ কথা দিল দু-চারদিনের মধ্যেই তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে।

পাহাড়ের চড়াই-উতরাইতে ঘুরতে ঘুরতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ছকুরাম। বলল, 'চল্ ফিতু´, ফিরে যাই।'

ফিতু´ বলল, 'আভি ফিরবি ছকুয়াজি? এখনো তো বহুত আদমি বাকি রইল।'

এখনও অনেক খাতকের কাছে পাওনা আদায় বাকি, এই কথাটাই বোঝাতে চাইল ফিতু´।

ছকুরাম বলল, 'আজ থাক। কাল ওদের সাথ মুলাকাত করব।'

'তবে চল্ —'

ফিতু´কে নিয়ে নিজের চালায় ফিরে এল ছকুরাম।

এখন দুপুর। সূর্যটা খাড়া মাথার উপর এসে উঠেছে। রোদে পুড়ে আকাশটা গলা তামার রঙ ধরেছে। তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

খাতকদের কাছ থেকে যে ধান, ভুট্টা আর জোয়ার পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে ফিতু´।

ছকুরাম বলল, 'জওয়ারগুলো মহাজনের গদীতে দিয়ে দামটা নিয়ে আয় ফিতু´।'

বতিয়া নদীর একপাশে হাটের চালা। আরেক পাশে মারোয়াড়ি শেঠেদের আড়ত। একটা আড়তের সঙ্গে ছকুরামের বন্দোবস্ত আছে,

ধান-গম-ভুট্টা—যা-ই সে পাঠাক না, আড়তের মালিক সব কিছু কিনে নেবে।

ফিতু´ নামে সেই অবোধ পশুটার যেন ক্লান্তি নেই। ধান গম আর জোয়ারের বস্তা কাঁধের ওপর তুলে তুলতে তুলতে আড়তগুলোর দিকে চলে গেল সে।

সামনেই একটা উঁচু ঢিবি। একসময় ফিতু´র বিশাল অবয়বটা ঢিবির ওপারে অদৃশ্য হল।

আর নিজের চালায় বসে ছকুরাম ভাবতে লাগল, আভনপুরে তার খাতকের সংখ্যা মোট একশ' পঞ্চাশ জন। আজ মাত্র দশজনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। এখনও একশ' চল্লিশ জন বাকী।

একসময় বিকেল হ'ল।

সূর্যটা পশ্চিমে শালবনের দিকে ঢলে পড়েছে। দুপুরে সে ছিল ক্রুদ্ধ, আগ্নেয়, ক্ষিপ্ত। তার রঙ ছিল গলা তামার মত। এখন তাকে ভারি অবসন্ন দেখাচ্ছে। রঙও তার বদলে গেছে।

এখন এই বিকেলে সূর্যটা টকটকে লাল। এত লাল, মনে হয় রক্তাক্ত।

একবার আকাশের দিকে তাকাল ছকুরাম। তারপর ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল।

সামনে টাঙাটা দাঁড়িয়ে আছে। বেঁটে টাট্টুটা চোখ বুঁজে ঘাস চিবুচ্ছে।

সকালে এখানে এসে হাটের চালায় খানকতক চট বিছিয়ে নিয়েছিল ছকুরাম। আস্তে আস্তে চটগুলো গুটিয়ে টাঙায় গিয়ে উঠল সে। তারপর টাট্টুটার পিঠে চাবুক বসিয়ে দিল।

ছকুরামের টাঙা গোরীগাঁও-এর দিকে ছুটল।

আট

ছকুরাম যখন ধনপতের ডেরায় এসে পৌঁছল তখন সন্ধে হয় হয়।

দিনটা প্রায় ফুরিয়ে গেছে। সূর্যটা কখন যেন শালবনের ও পাশে ডুব দিয়েছে। যে স্তিমিত নিরুত্তাপ আলোটুকু আকাশে আটকে আছে, একটু পর তাও আর থাকবে না।

টাঙা থেকে দাওয়ায় গিয়ে বসল ছকুরাম।

সেই ভোরবেলা খানচারেক শুকনো চাপাটি খেয়ে আভনপুর গিয়েছিল সে, তারপর আর কিছু খাওয়া হয় নি। চানও হয় নি। তা ছাড়া সমস্ত দিন খুবই পরিশ্রম গেছে। অবসাদে ক্লান্তিতে স্নায়ুগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছে।

আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ বসে রইল ছকুরাম।

একসময় হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল চারপাশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। সন্ধে নামতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। এখনও তার অনেক কাজ বাকি। চান করতে হবে, কাপড় ধুতে হবে, রুটি বানাতে হবে।

দাওয়া থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল ছকুরাম। উদ্দেশ্য, একটা কাচা কাপড় আর গামছা নিয়ে কুয়োয় চান করতে যাবে। সকালে আভনপুর যাওয়ার সময় দড়িতে কাপড় আর গামছাটা টাঙিয়ে রেখে গিয়েছিল সে।

আশ্চর্য! সে দুটো এখন পাওয়া গেল না। আতিপাঁতি করে অনেক খুঁজল ছকুরাম। কিন্তু খোঁজাটা বৃথা হ'ল।

কি ভেবে বাইরে এল ছকুরাম। তারপর উঠানে নেমে সোজা কুয়োর দিকে চলল।

কুয়োর কাছে এসে অবাক হয়ে গেল সে। এখানে একপাশে তার কাপড় আর গামছাটা পরিপাটি করে কে যেন গুছিয়ে রেখেছে। শুধু কাপড় গামছাই না, মাটির গাগরায় জলও তোলা আছে।

ছকুরামের মনে হ'ল, এ আয়োজন তারই জন্য। কিছুক্ষণ কাপড়-গামছা আর জলের গাগরাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টিটা রুক্ষ আর বিরক্ত হয়ে উঠল। মুখের ওপর কতকগুলো রেখা ফুটল। রেখাগুলো কঠিন এবং গভীর। মনে হয় কেউ যেন ছুরি বসিয়ে দাগ কেটেছে।

চুপচাপ খানিকটা সময় কাটল।

তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল ছকুরাম, 'ধনপতজি—'

কেউ সাড়া দিল না।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ছকুরাম, 'এ ধনপতজি—এ বুড্‌ঢা—'

এবার খুব মৃদু গলায় কে যেন বলে উঠল, 'বাপুজি কোঠিতে নেই।'

ছকুরাম চমকে গেল। দেখল, উঠানের এককোণে রুগ্ন চেহারার একটা আঁওলা গাছের তলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। সেই মেয়েটি নাম যার তিলিয়া। ছকুরাম বুঝল, তিলিয়াই তার কথার জবাব দিয়েছে।

ছকুরাম শুধলো, 'ধনপতিজি কুথা গেছে ?'

তিলিয়া বলল,'ভঁইসা দুটো নিয়ে দুপুর বেলা মাঠে গেছে। আন্ধার হয়ে এল, এখনো ফিরছে না।' একটু থেমে আবার বলল, 'বাপুজির সাথ কুছ দরকার আছে ?'

'হাঁ—'

'কী দরকার ?'

ছকুরাম বলল, 'আমার কাপড়-গামছা কে এখানে এনেছে ? গাগরায় কে পানিয়া ভরে রেখেছে ? তুমহার বাপুজি থাকলে এই বাতদুটো পুছতাম (জিগ্যেস করতাম)।'

'বাপুজিকে পুছে ফায়দা নেই।'

'তবে কাকে পুছব ?'

'আমাকে।'

'তুমহাকে !' ছকুরামের গলায় বিস্ময় ফুটল।

'হাঁ।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল ছকুরাম। তারপর বলল, 'তুমিই তা হলে এ-সব করেছ ?'

'হাঁ।'

'কে তুমহাকে এ সব করতে বলেছে ? ধনপত বুড্‌ঢা ?'

'না, আমি নিজেই করেছি। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।'

'কভি আর অ্যায়সা করবে না। এ সব আমি পসন্দ করি না। সামঝালে ?' ছকুরাম বলল। বলেই তিলিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

দিনের শেষ আলোর রেশটুকু একেবারে মুছে যায় নি। এদিকে অন্ধকারও নামতে শুরু করেছে। আলো-আঁধারির লীলায় তিলিয়ার মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল ছকুরাম। তারপর তিলিয়ার দিক থেকে চোখ সরিয়ে গায়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল।

চান সেরে ছকুরাম যখন ঘরে ফিরে এল তখন রাত হয়ে গেছে। তারায় তারায় আকাশটা ছয়লাপ। উঠানে আর কুয়োর পারে জোনাকিরা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

আজ শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। চন্দনের পাটার মত গোল চাঁদ দেখা দিয়েছে। গোরীগাঁও এর চারপাশে চাঁদের আলো বিচিত্র এক মায়াবরণ টেনে দিতে শুরু করেছে।

ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। কোথায় লণ্ঠন আর কোথায় দেশলাই —ঠাওর পাওয়া যাচ্ছে না।

ছকুরাম একবার ভাবল, তিলিয়াকে ডেকে একটা লণ্ঠন আনতে বলে। আবার ভাবল, থাক। দ্বিধার মধ্যে তার মনটা দোল খেতে লাগল।

আশ্চর্য ! ঠিক এই সময় একটা লণ্ঠন নিয়ে দেখা দিল তিলিয়া। ঘরের মাঝখানে সেটা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

বিস্মিত ছকুরাম ভাবতে চেষ্টা করল, তিলিয়া নামের এই মেয়েটা অন্তর্যামী কি না ! মনে মনে সে যে তার কথাই ভাবছিল তিলিয়া

কি তা টের পেয়েছে

একটু পরেই বিস্ময় কেটে গেল। ধাতস্থ হ'ল ছকুরাম। সে হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, কোন বিস্ময়ই যাদের বেশিক্ষণ আবিষ্ট করে রাখতে পারে না।

এদিকে অনেকটা রাত হয়েছে। ছকুরাম ভাবল, রান্নাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার।

রাঁধতে গিয়ে আরেকবার অবাক হতে হ'ল তাকে।

ঘরের এককোণে উনুনটা রয়েছে। তার পাশে লকড়িগুলো কে যেন টুকরো টুকরো করে কেটে গুছিয়ে রেখেছে। শুধু লকড়িই নয়, আটা মেখে রুটিও বেলে রেখেছে, ভাজির জন্য আলু কুটে ধুয়ে রেখেছে।

হাতের কাছে যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে। এখন শুধু রান্নাটা বসিয়ে দিলেই হয়।

অর্ধস্ফুট গলায় ছকুরাম বলল, 'জরুর সেই লেড়কিটার কাম।'

'হাঁ—' কে যেন জবাব দিল।

চমকে ঘুরে বসল ছকুরাম। দেখল, ঘরের ঠিক বাইরে দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিলিয়া। লণ্ঠনের আলোটা সরাসরি তার সমস্ত দেহের ওপরে গিয়ে পড়েছে।

কাল এখানে এসেছে ছকুরাম। কাল একবার মাত্র তিলিয়াকে দেখেছিল।

কাল তার দেখার মধ্যে কোন বিশ্লেষণ ছিল না। চোখে পড়েছিল, তাই দেখেছিল। চলতে চলতে লোকে যেমন আকাশ দ্যাখে কি অন্য কোন দৃশ্য দ্যাখে ঠিক তেমনি দেখেছিল। চোখের দেখাটার সঙ্গে মনের কোন সংযোগ ছিল না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ছকুরামের মনে হ'ল, তিলিয়া নামে এই মেয়েটার মুখ-চোখ, হাত-পা, চাউনি—সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিলিয়া। দাঁড়াবার

ভঙ্গিটি তার আশ্চর্য ঋজু। এই ঋজুতার মধ্যে কোথায় যেন তার চরিত্রের একটা ইঙ্গিত রয়েছে।

কাল বিকেলের হঠাৎ দেখায় মনে হয়েছিল, মেয়েটার চোখ খুব শান্ত আর ছায়াছন্ন। আজ মনে হ'ল, কালকের দেখাটা ঠিক ছিল না। আসলে চোখ তুটি বড় বেশি গভীর, বড় বেশি দূরগামী। যার দিকে সে তাকায়, বোধ হয় তার বুকের অতল পর্যন্ত দেখতে পায়।

ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু হাসি আটকে আছে। হাসিটা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি বিচিত্র। সূক্ষ্ম আর বিচিত্রই শুধু নয়, এই হাসিটার মধ্যে কোথাও যেন খানিকটা কারচুপি আছে।

দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকে তিলিয়ার স্বভাব সম্বন্ধে যদিও বা কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, তার হাসিটা থেকে কোন ধারণাই করা যায় না।

ছকুরামের মনে হ'ল, ঠোঁটের ওপর এই অদ্ভুত হাসিটাকে ফুটিয়ে রেখে ভেতরের সবটুকু রহস্যকে গোপন করে রেখেছে তিলিয়া।

তিলিয়া বলল, 'আমিই তুমহার রোটি বেলে রেখেছি। ভাজির আলু কুটে দিয়েছি।'

তীব্র কর্কশ গলায় ছকুরাম বলল, 'লেকেন কেন? তুমহার মতলব কী?'

তিলিয়া জবাব দিল না।

ছকুরামও আর কিছু বলল না। উনুনে আগুন ধরিয়ে রুটি বানাতে বসল। রুটি বানাতে বানাতে তিলিয়ার কথা ভাবতে লাগল।

এই মেয়েটা বড় আজব, বড় তুর্জ্ঞেয়। তার কথা যত ভাবছে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে ছকুরাম।

তিলিয়া তার আত্মীয় না, পরিচিত না, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। মেয়েটা যে কে, কী তার পরিচয়, কোন সুবাদে সে ধনপতের ডেরায় এসে আছে, কিছুই জানে না ছকুরাম। তিলিয়াকে এই প্রথম দেখল সে। অথচ কি আশ্চর্য! মেয়েটা

তার জন্ম কুয়োর পারে কাপড়-গামছা গুছিয়ে রেখেছে, চানের জল তুলে দিয়েছে, রান্নার সব আয়োজন করে দিয়েছে। তাতেই খুশী থাকে নি। এই মুহূর্তে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিলিয়ার আচার-আচরণ, কোনটাই যেন স্বাভাবিক না।

উদ্দেশ্য কি মেয়েটার? নিজেকে বার বার এই প্রশ্নটা শুধলো ছকুরাম। কিন্তু কোন সদুত্তর মিলল না। মিলল না বলেই সে ভাবল ধনপত ফিরে এলে তার কাছে তিলিয়ার আচরণের কৈফিয়ত চাইবে।

বাইরের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে তিলিয়াও ভাবছিল। মাস দুই হ'ল, ধনপতের কাছে আশ্রয় পেয়েছে সে। এই দু মাস প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত ধনপতের মুখে ছকুরামের কথা শুনেছে। ছকুরাম নামে এই মৈথিলী ব্রাহ্মণটা নাকি প্রীতি, স্নেহ, আন্তরিকতা—এ সবের ধার ধারে না। হৃদয় বলে কোন বস্তুই তার নেই।

ছকুরাম নাকি নিজের হাতে রেঁধে খায়। নিজের যাবতীয় কাজ নিজেই করে।

নিজের কাজ নিজে করে নেবার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্যের কথা হ'ল, আন্তরিকতার বশে কেউ যদি তার কাজে সাহায্য করতে চায়, সে নাকি খুব বিরক্ত হয়। আদর করে যদি কেউ কিছু খেতে দ্যায়, ছকুরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। দু মাস ধরে ধনপতের মুখে অনবরত তার কথা শুনে আসছে তিলিয়া। শুনতে শুনতে তাকে দেখার একটা ইচ্ছা তিলিয়াকে পেয়ে বসেছিল। দিনে দিনে ইচ্ছাটা প্রবল হয়েছিল।

দাওয়ার খুঁটিতে শরীরের ভার রেখে ভেবেই চলেছে তিলিয়া। ছকুরাম নামে এই লোকটা কত নিষ্ঠুর আর কতখানি হৃদয়হীন হতে পারে, সে একবার দেখবে।

নয়

সেই দুপুরবেলা মোষ নিয়ে বেরিয়েছিল ধনপত, এইমাত্র ফিরে এল।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

এই এক দোষ ধনপতের, প্রায় মোষ চরিয়ে ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যায়।

কেউ যদি বলে, 'এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাক। শেষে একটা বিপদ বাধাবে, দেখছি।'

ধনপত বলে, 'কিসের বিপদ ?'

'জান না, কিসের বিপদ! রাত্তিরে শের (বাঘ) বার হয়।'

'শের আমার কিছু করবে না। ওরা জানে, আমার গায়ের মাংস বড় তেতো—' বলেই জোরে জোরে হেসে ওঠে ধনপত।

যে যাই বলুক, কারো কথা গ্রাহ্যই করে না ধনপত। রাত করে বাড়ি ফেরা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কোণের ঘরে মোষদুটোকে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ধনপত, তারপর মাঝখানের ঘরে এসে উঁকি দিল। দেখল হ্যারিকেনের সামনে ঝুঁকে বসে কি যেন লিখছে ছকুরাম। খুব সম্ভব, তার ব্যবসার হিসাব-পত্তর নিয়ে মেতে আছে।

খুব আস্তে ধনপত ডাকল, 'ছকুয়া—'

গলার স্বরেই ছকুরাম বুঝতে পারল, ধনপত ফিরেছে। হিসেবের খাতা থেকে মুখ না তুলে সে সাড়া দিল, 'হাঁ—'

'তুমহার খাওয়া হয়েছে ?'

'হাঁ।'

ধনপত জানে, রাত্তিরে খাওয়ার পর ছকুরামের চোখ ঢুলে আসে। যত জরুরী কাজই থাক, এ সময়টা তাকে বসিয়ে রাখা যায় না। খাওয়ার পর সে শুয়ে পড়বেই।

কিন্তু আজ একেবারে ব্যতিক্রম। খাওয়ার পর বসে বসে সে

হিসাব লিখছে। যেন অবাকই হ'ল ধনপত। অবাক ভাবটা কাটলে শুধলো, 'এখনও শোও নি যে! ঘুম পায় নি?'

'ঘুম ঠিকই পেয়েছে।' ছকুরাম বলল।

'তবে?'

তুমহার জন্যে বসে আছি।' ছকুরাম বলতে লাগল, 'বসে আছি তো বসেই আছি। তুমহার কোন পাত্তা নেই। এদিকে ঘুমে আঁখ বুজে আসছে। কি করব, ঘুম ছুটাবার জন্যে হিসেবের খাতা নিয়ে বসেছি।'

জিজ্ঞাসু চোখে ছকুরামের দিকে তাকাল ধনপত। বলল, 'আমার জন্যে জেগে বসে আছ?'

'হাঁ!'

'কেন?'

'তুমহার সাথ ক'টা কথা আছে।'

'কী কথা?'

'খাওয়া-দাওয়া সেরে এস। তারপর বলব।'

ধনপত আর দাঁড়াল না। বাঁ পাশের ঘরখানার দিকে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ধনপত যখন ফিরে এল তখন আর হিসাব লিখছে না ছকুরাম, বিছানা পেতে তার ওপর চুপচাপ বসে আছে।

ঘরের এককোণে ছকুরামের বিছানা পড়েছে। আরেক কোণে মোটা মোটা চট বিছিয়ে ধনপত তার বিছানা পেতে নিল। তারপর সারা শরীরে একটা ভারী চাদর জড়িয়ে বসল।

ধনপতের ডেরায় মোট তিনখানা ঘর। ডানপাশের ঘরে ছকুরামের টাট্টু আর ধনপতের মোষ দুটো থাকে, বাঁ পাশের ঘরে থাকে তিলিয়া, মাঝখানের ঘরে ধনপত আর ছকুরাম।

একবার বাইরের দিকে তাকাল ধনপত।

কুয়াশা আর চাঁদের আলোতে বাইরেটা আচ্ছন্ন। আকাশে

ত্রয়োদশীর চাঁদ আছে। কিন্তু সন্ধে থেকে এত কুয়াশা পড়েছে, যার জন্য তাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিয়েছে। উঠানের একধারে যে সঙ্গীহীন আঁওলা গাছটা সারাদিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলার হাওয়া লেগে আর পাতাগুলো ফিসফিস করে কি এক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ঘরের মধ্যে নিয়ে এল ধনপত। সোজাসুজি ছকুরামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলবে, বল—'

রূঢ় গলায় ছকুরাম শুরু করল, 'এসব ভাল না ধনপতজি—'

ছকুরামের গলা শুনে মনে মনে শঙ্কিত হল ধনপত। বিপন্ন মুখে প্রশ্ন করল, 'কী সব ?'

'ওই যে লেড়কিটা—তিলিয়া—'

ছকুরামের কথা শেষ হবার আগেই ধনপত বলে উঠল, 'কি করেছে তিলিয়া ?'

চানের জন্য জল তুলে রাখা থেকে রান্নার আয়োজন পর্যন্ত যা-যা তিলিয়া করেছে আদ্যোপান্ত সব বলল ছকুরাম। তারপর কি একটু ভেবে আবার আরম্ভ করল, 'তুমি তো জান, এ সব আমি পসন্দ করি না। তিলিয়াকে বলে দিও, সে যেন আমার কোন কাম না করে।'

'আচ্ছা বলে দেব।'

'আওরতের (মেয়েমানুষের) এমন হওয়া ঠিক না।' ছকুরাম আবার বলল।

'কেমন ?'

'এই অচেনা আদমীর কাম করে দেওয়া, তার কাছে এসে দাঁড়ানো—এ সব বহুত খারাপ। লেড়কিটাকে একটু শরমিলা (লাজুক) হতে বলো।'

ধনপত জবাব দিল না। মুখ বুজে বসে রইল।

একটু চুপ।

হঠাৎ ছকুরাম শুধুলো, 'লেড়কিটা কে ? তুমহার কেউ হয় নাকি ?'

ধনপত চমকে উঠল।

দশ বছর এখানে যাতায়াত করছে ছকুরাম। কিন্তু কৌতূহল জিনিসটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কোন দিন কোন ব্যাপারে তার কৌতূহল দেখা যায় নি। কিন্তু আজ যত বিরূপতা আর যত বিরক্তিই থাক, তিলিয়া সম্বন্ধে খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছে সে।

বিস্মিত ধনপত একদৃষ্টে ছকুরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে একসময় জিগ্যেস করল, 'তিলিয়ার কথা শুনবে?'

'বল।' ছকুরাম মাথা নাড়ল।

ধনপত যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম।

এখান থেকে মাইলখানেক দূরে বস্তার জেলার শালবন। শালবনের ধার ঘেঁসে সোনাহুরুদের একটা গ্রাম আছে। গ্রামখানার নাম জুগানিয়া।

'সোনাহুরু' শব্দটার সঙ্গে সোনাদানার সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু জুগানিয়া গ্রামের লোকেরা কোনদিন সোনারুপোর চেহারা দেখে নি।

মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ মাটিতে তারা আবাদ করে, ফসল ফলায় আর অবসর সময়ে শালবনে হরিণ শিকার করে। এই তাদের জীবন।

জুগানিয়া গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন মানুষ বিষণ সোনাহুরু। প্রায় আট-দশ বিঘা ক্ষেতি আছে তার। আর আছে পাঁচ-পাঁচটা প্রকাণ্ড ভঁইসী।

এই বিষণেরই ভাতিজি হ'ল তিলিয়া। তিলিয়ার বাপ-মা কেউ নেই। দূর সম্পর্কের চাচা বিষণের কাছেই সে মানুষ।

বিষণ সোনাহুরুর স্বভাবটা ছিল সাজ্ঘাতিক। তার প্রাণে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই। বাপ-মা-মরা ভাতিজিটাকে দিনরাত সে খাটিয়ে মারত। শুধু সংসারের খাটুনিই না, পাঁচ-পাঁচটা ভঁইসী আর আটদশ বিঘা ক্ষেতির যাবতীয় ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হত।

দু-বেলা পাঁচখানা করে মোট দশখানা রুখা রোটির জন্য মুখ বুঁজে খেটে যেত তিলিয়া।

এমন ভাবেই দিন কাটছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সবার অগোচরে, বুঝিবা নিজের অজান্তে বড় হয়ে উঠল তিলিয়া। পনেরতে পা দিল সে।

বিষণের সংসারে দুবেলা পেট পুরে খাওয়া জুটত না, তার ওপর দিবারাত্রি খাটুনি। তবু কি বিস্ময়, তিলিয়ার দেহে ঢল নামল। হাত পা-বুক-মুখ—যেখানে যত অপূর্ণতা আর অভাব ছিল পনেরর ঢল তাদের সব কিছুকে ছাপাছাপি করে ভরে দিল।

এতকাল গায়ের চামড়া ছিল রুক্ষ কর্কশ, নখের সামান্য আঁচড়েই খই উড়ত। চোখদুটো তার মানুষের বলে মনে হ’ত না। মনে হ’ত, একজোড়া বাছুরীর চোখ ভয়ে আতঙ্কে সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

হঠাৎ কি হ’ল, তিলিয়ার চামড়া আর কর্কশ রইল না। আশ্চর্য মসৃণ হয়ে গেল। চোখের চাউনিতে পৃথিবীর কি এক রহস্য যেন ফুটি ফুটি করতে লাগল।

তিলিয়া যুবতী হয়ে গেল।

ভাতিজির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল বিষণ। বলল, ‘হে ভগোয়ান, মাগীটা এবার আমায় খতম করবে।’

বিষণের চমকাবার কারণও আছে।

জুগানিয়া নামে সোনাদুরুদের সেই গ্রামখানার সামাজিক নিয়মগুলি বড় নিষ্ঠুর। প্রায় আদিমের পর্যায়েই আছে। সেখানে পনের বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়। এ নিয়ম অবশ্য পালনীয়। কোন কারণে কোন মেয়ের বয়স যদি পনেরর সীমা পেরিয়ে যায়, জুগানিয়া গ্রামের সামাজিক আইন নির্মম হয়ে ওঠে। মেয়েটি যার কাছেই থাক, সে তার বাপ হোক, ভাই হোক, চাচা-মামা যে-ই হোক, সমাজে তার আর স্থান নেই। সোনাদুরুদের চোখে সে হেয় এবং পতিত হয়ে যায়। তার সঙ্গে কেউ

কোন সম্পর্ক রাখে না।

তিলিয়া পনেরতে পড়েছে। বিষণের পক্ষে ভাবনার কথাই। তিলিয়ার বয়সটাই শুধু ভাবনার কারণ নয়, কারণটা আরো গূঢ় এবং গভীর।

বিষণ বেশ সম্পন্ন মানুষ। শুধু সম্পন্নই না, জুগানিয়া গ্রামের মুরুব্বি সে। সমাজে তার প্রতিপত্তি আছে, মর্যাদা আছে। লোক তাকে মানে। তার মুখ থেকে একটা কথা খসলেই তিলিয়ার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। বিয়ে তো হতে পারে, তার জন্যে কমপক্ষে দু-তিন কুড়ি টাকা খরচ করতে হবে। দূর সম্পর্কের ভাতিজির জন্য অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করতে বিষণ সোনাহুরু একেবারেই নারাজ।

কাজেই পনের বছরের মধ্যে তিলিয়ার শাদি আর হ'ল না। আস্তে আস্তে তার বয়স বাড়তে লাগল।

বিষণ জুগানি গ্রামের মুরুব্বি। প্রথম প্রথম ভয়ে কেউ কিছু বলে নি। কিন্তু পনের পর একটি একটি করে তিলিয়ার বয়স যখন আরো তিন বছর বাড়ল, তখন গুঞ্জন শুরু হ'ল।

গুঞ্জনটা গুঞ্জনই রইল না। শেষ পর্যন্ত সেটা উত্তেজনার রূপ নিল।

উত্তেজিত সোনাহুরুরা প্রথমে 'পঞ্চ' (পঞ্চায়েত) বসাল। তারপর বিষণের ডেরায় গিয়ে হানা দিল। জিগ্যেস করল, 'এটা কী হচ্ছে মুরুব্বি ?'

'কোনটা ?' পাল্টা প্রশ্ন করল বিষণ।

'এই যে আঠারো বরষ উমর (বয়স) হ'ল তুমহার ভাতিজির, এখনো তার শাদি দিচ্ছ না। এটা কি আচ্ছা কাম !'

বিষণ জবাব দিল না। দিতে পারল না।

সোনাহুরুরা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'পন্দর বরষ উমরের মধ্যে লেড়কির শাদি দিতে হয়। এ হ'ল আমাদের কানুন। লেকেন মুরুব্বি হয়ে তুমি সেই কানুন ভাঙছ—'

অগত্যা বাধ্য হয়েই তিলিয়ার শাদি ঠিক করল বিষণ সোনাহুরু।

যে ছেলেটির সঙ্গে শাদি ঠিক হ'ল, তার নাম রূপা। বাড়ি রুগ জেলায়।

শাদি তো ঠিক হ'ল কিন্তু তিলিয়া নামের মেয়েটা বড়ই বদনসীব। নইলে শাদির দিন পাঁচেক আগে রূপার হাত ভাঙবে কেন?

রূপার হাত ভেঙেছে। সঙ্গে সঙ্গে সোনাহুরুদের আদিম সংস্কার রায় দিয়ে বসল, তিলিয়া মেয়েটা খুবই অলক্ষণা। অলক্ষণাই যদি না হবে, শাদির আগে ছেলের হাত ভাঙবে কেন?

শাদির আগে হাত ভেঙেছে, না জানি শাদির পর আরো কী ঘটবে! কাজেই রূপার বাপ 'মাঙ্গি' (বিয়ের সম্বন্ধ) ভেঙে দিল।

যে মেয়ের 'মাঙ্গি' একবার ভেঙে যায়, তার আর শাদি হয় না। তিলিয়ারও হবে না!

তিলিয়ার শাদি না হলে সারা জীবন কে তাকে খাওয়াবে? কে পরাবে? কে তার দায় নেবে? শাদি ভাঙার পর নিজের মনকে এই প্রশ্নগুলো শুধলো বিষণ। এতগুলো প্রশ্নের মাত্র একটাই জবাব ছিল। সারা জীবন ধরে তিলিয়াকে তারই পুষতে হবে। কারণ এত বড় দুনিয়ায় সে ছাড়া তিলিয়ার আপন বলতে আর কেউ নেই।

বিষণ যেন ক্ষেপে উঠল। তিলিয়ার ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে দিল সে।

যখন তখন বিষণ বলত, 'নিকাল যা মাগী, নিকাল যা—মেরে কোঠিসে আভি নিকাল যা।'

অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বেরিয়েই পড়ল তিলিয়া। কিন্তু সমস্ত দেহে আঠারো বছরের প্লাবন নিয়ে সে কোথায় যাবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে?'

বিষণচাচা তাকে গালাগাল দিয়েছে, নিগ্রহ করেছে তবু সে তার মাথার ওপর ছিল। এতকাল কেউ তাকে উত্যক্ত করতে সাহস পায় নি। কিন্তু এখন তো অবাধ সুযোগ। কেউ তার সহায় নেই। অথচ

চারপাশে দু-পা-ওলা নেকড়েরা ওত পেতে আছে। একটু অসাবধান হলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ভাগ্য নামে একটা অদৃশ্য জাদুকরের হাতে সঁপে দিয়ে মধ্যপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল তিলিয়া।

ঘুরতে ঘুরতে মাস দুই আগে গোরীগাঁওতে এসেছিল সে। সব কথা শুনে তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে ধনপত! নিজেদের মধ্যে সম্পর্কও ঠিক করে নিয়েছে। ধনপত হয়েছে ধরম বাপ, তিলিয়া ধরমবেটি।

তিলিয়ার কথা শেষ করে ছকুরামের দিকে তাকাল ধনপত। বলল, 'দো মাহিনা হ'ল লেড়কিটা আমার কাছেই আছে।'

'হাঁ—' অস্ফুট একটা শব্দ করল ছকুরাম।

'তিলিয়াকে নিয়ে ভারি ভাবনায় পড়েছি। কি যে করব বুঝতে পারছি না।'

ছকুরাম জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

দশ

পরের দিনও আভনপুর থেকে ফিরে এসে ছকুরাম দেখল, কাপড় আর গামছাখানা কুয়োর পারে গুছনো রয়েছে। মাটির গাগরায় জল ভরা আছে। রান্নার সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

খুবই বিরক্ত হ'ল ছকুরাম। রুক্ষ গলায় শুধলো, 'আবার এ সব করে রেখেছ যে?'

কালকের মত আজও উঠানের এককোণে সেই আঁওলা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে তিলিয়া। খুব মনোযোগ দিয়ে ছকুরামের কথাগুলো শুনল সে। শুনলই শুধু, কিছু বলল না। ছকুরাম গজ গজ করতে লাগল, 'কাল ধনপতজিকে বলে দিলাম, আমার কাজ কারোকে করতে হবে না। সে তুমহাকে বারণ করে নি?'

'করেছে।' ঘাড় কাত করল তিলিয়া।

'তবে?'

এবার আর জবাব দিল না তিলিয়া। তার টেপা ঠোঁটে সেই হাসিটা ফুটে উঠল। সেই বিচিত্র হাসিটা যা দিয়ে নিজের অগাধ রহস্যকে গোপন করে রাখে সে।

তারপরের দিনও একই ব্যাপার। তারপর থেকে নিয়মিত প্রতিদিন।

হাজার বিরক্ত হয়েও হাজাব রাগ করেও কিছুতেই কিছু হ'ল না। তিলিয়া তার কথা গ্রাহ্যেই আনল না।

আস্তে আস্তে তিলিয়ার এই সেবাটুকু ছকুরামকে মেনে নিতে হ'ল।

কিন্তু চানের জল তুলে আর রান্নার আয়োজন করে দিয়েই খুশী রইল না তিলিয়া। আরো একটু এগুলো সে।

আভনপুব থেকে ফিরে এসে চান সেরে একদিন রাঁধতে বসেছে ছকুরাম।

রুটি বানানো হয়ে গেছে। এবার আলুর ভাজিটা করে নিতে পারলেই রান্নাবান্নার কাজ চুকে যাবে।

উনুনে কড়া বসিয়ে জল ঢালল ছকুরাম। তারপর আলুতে মশলা আর নুন মাখিয়ে যখন ছাড়তে যাবে, ঠিক সেই সময় বাধা পড়ল, 'অয়সা নহি, অয়সা নহি—'

সাঁ করে ঘুরে বসল ছকুরাম। কি আশ্চর্য? তার পিঠের কাছে উবু হয়ে বসে আছে তিলিয়া।

রান্নার সময় কোনদিনই তার ঘরে ঢোকে না মেয়েটা। কিন্তু আজ ঢুকেছে। তিলিয়ার মনে কী আছে, কে জানে!

তিলিয়া বলতে লাগল, 'অয়সা নহি। কড়া থেকে পানিয়া ফেলে দাও। ঘিউ দিয়ে মশলা ভেজে নাও। তারপর পানিয়া দেবে।'

ছকুরাম কিছু বলল না। একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন চোখে তিলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে তার মুখে একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি ফুটে বেরুল।

একটু চুপ।

তিলিয়াই আবার শুরু করল, 'আমার দিকে চেয়ে রইলে যে—'

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় কি যেন বলল ছকুরাম।

তিলিয়া বলতে লাগল, 'আমার দিকে না চেয়ে থেকে ভাজিটা বানিয়ে ফেল। পয়সা আলুয়া ঔর মশলাটা ভাজ। উসকো বাদ—'

কি একটু চিন্তা করল ছকুরাম। তারপর তিলিয়ার কথামত আলুর ভাজিটা তৈরী করে নিল।

রাত্রে খেতে খেতে ছকুরামের মনে হ'ল, আলুর ভাজিটা আজ ভারি চমৎকার হয়েছে।

এতকাল নিজের হাতে রেঁধে খাচ্ছে সে। তার রান্নায় না আছে যত্ন, না আছে পরিপাটি। কোন রকমে রুটি ক'খানা সেঁকে নেয় সে। সেঁকতে গিয়ে প্রায়ই সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে। তরকারিটা কোনদিনই ঠিকমত হয় না। হয় কাঁচা থাকে, নয়ত এত বেশী সিদ্ধ হয়ে যায় যার ফলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠে। বছরের পর বছর নিজের তৈরী সেই বিস্বাদ আর অভক্ষ্য খাদ্যগুলি খেয়ে আসছে ছকুরাম।

খেতে খেতে ছকুরাম ভাবল, আজ প্রথম তার রান্নায় স্বাদ এসেছে।

ভারি সুন্দর একটা স্বাদ।

কে তার রান্নায় এই স্বাদটা এনে দিয়েছে? কে?

চকিতে সেই মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। সেই মেয়েটা, যার নাম তিলিয়া।

'তিলিয়া, তিলিয়া—' মনে মনে বার দুই নামটা জপ করল ছকুরাম।

এগার

এতকাল তার সঙ্গী বলতে ছিল দুটো মাত্র মোষ। এই মোষদুটোর সঙ্গে নিজের প্রাণের যাবতীয় কথা বলত ধনপত। সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায় অবোধ জীবদুটো ছিল তার জীবনের শরিক।

রোগ বলতে তার ছিল বাতের একটা ব্যথা। ব্যথাটা অনেক দিনের। প্রায় বিশ বছর ধরে নিজের হাড়ের ভেতর তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে ধনপত। যত বিরূপতাই থাক, বিশ বছর যার সঙ্গে বাস, স্বভাবতই তার প্রতি মানুষের টান এসে যায়। রাতের ব্যথাটার ওপর ধনপতের কেমন একটা মায়া বসে গেছে। কিছুতেই সে সেটাকে সারাতে চায় না।

দুটো মোষ তার বাতের ব্যথাটাই শুধু নয়, ধনপতের জীবনে আরো একটা বস্তু আছে। বিচিত্র শোনালেও সেই বস্তুটা হ'ল একটা বিলাস।

মানুষ মাত্রেই বিলাস আছে। তা সে মানুষ রাজাই হোক আর ফকিরই হোক। কাজেই ধনপতেরও যে একটা বিলাস থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পড়শী সখিলালের সঙ্গে বিঘেদেড়েক জমি নিয়ে পনের বছর ধরে তার মামলা চলছে। এই মামলাটা ধনপতের বিলাস।

মোষদুটো, বাতের ব্যথাটা আর সখিলালের সঙ্গে মামলা— এই নিয়েই এতকাল সন্তুষ্ট ছিল ধনপত। পৃথিবীর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী তার ছিল না।

কিন্তু ইদানীং ভারি বিপদে পড়েছে সে। রোগ, মামলা আর মোষদুটোর সঙ্গে একটা ভাবনা এসে জুটেছে। এই ভাবনাটা হ'ল তিলিয়া। তিলিয়া নামে সোনাদুরুদের এই মেয়েটাকে নিয়ে সে যে কী করবে – ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মেয়েটার বিয়ে ভেঙে গেছে। ফলে চাচা বিষণ সোনাদুরু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ধনপত যদি তাকে ঠাঁই না দিত মধ্য প্রদেশের তাবত চিল আর শকুন—সবাই জোট বেঁধে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত।

আশ্রয় তো সে তিলিয়াকে দিয়েছে। কিন্তু এই আশ্রয়ের মেয়াদ আর ক'দিন!

ধনপতের বয়স ষাট পেরিয়েছে। আর ক'বছরই বা সে বাঁচবে?

দু বছর, চার বছর, খুব বেশি হ'লে বছর দশেক। কিন্তু তারপর? তারপর মেয়েটার কী গতি হবে? কাজেই বেঁচে থাকতে থাকতে ধনপত তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে চায়। যাতে সুখে না হোক, অন্তত দেহের মর্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে নিরাপদে বাঁচতে পারবে তিলিয়া।

তার সম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করেছে ধনপত।

কেউ বলেছে, মেয়েটাকে বিষণ সোনাহুরুর কাছেই দিয়ে এস। হাজার হলেও ভাতিজি। রক্তের একটা টান তো আছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে, নিশ্চয়ই বিষণ তাকে রাখতে রাজী হবে।

কেউ আবার অন্য হদিস দিয়েছে। কেশকাল পাহাড়ের কাছে কোথাও নাকি খ্রীস্টান পাদ্রিরা একটা আশ্রম খুলেছে। এ দেশের যত অনাথ মেয়ে সেখানে আশ্রয় পাচ্ছে। তিলিয়াকে সেখানে রেখে এলে নাকি ভালই হবে।

নানা জনে নানা পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু কোনটাই ধনপতের মনঃপূত হয় নি। চাচা বিষণের কাছেই থাক আর পাদ্রী সাহেবদের আশ্রমেই থাক—কোথাও তিলিয়ার নিজের ঘর নেই। পরের ঘরে পরের অনুগ্রহে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সেই বাঁচার মধ্যে সম্মান নেই।

মেয়েমানুষের নিজের ঘর কোন্‌টা? কোথায় সে সবচেয়ে নিরাপদ? সবচেয়ে সম্মানিত? নিশ্চয়ই তার স্বামীর ঘরে।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত ধনপত ঠিক করেছে, তিলিয়ার বিয়ে দেবে।

বিয়ে তো দেবে কিন্তু ছেলে পাবে কোথায়?

তিলিয়ার বিয়ে একবার ভেঙে গেছে। সোনাহুরু সমাজের প্রথা অনুযায়ী আর তার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। ধনপত তা জানে। জেনেও সে দমে নি। অসম্ভবের পেছনে সে ছুটতে শুরু করেছে।

রায়পুর জেলায়, বস্তার জেলায় আর দ্রুগ জেলায় যেখানে যত সোনাহুরু আছে, সবার ঘরে ঘরে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে ধনপত।

সে যেন পণ করেছে, এমন একটা ছেলেকে খুঁজে বার করবে মনটা যার আকাশের মত উদার এবং বিস্তৃত সব জেনে শুনেও তিলিয়ার মত মেয়েকে বিয়ে করতে যে রাজী।

এখন অনেকটা বেলা হয়েছে।

দাওয়ায় বসে 'চুট্টা' ফুঁকছিল ধনপত। ছকুরাম বাড়ি নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই টাঙা হাঁকিয়ে আভনপুর চলে গেছে।

তিলিয়া অবশ্য বাড়িতেই আছে। কুয়া থেকে জল তুলে তুলে গাগরা ভর্তি করছে।

ধনপত ডাকল, 'তিলিয়া বিটি—'

'হাঁ—' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল তিলিয়া।

'রোটি বানানো হয়ে গেছে?'

'হাঁ।'

'আমাকে তা হ'লে খেতে দে।'

'এত জল্‌দি খেতে চাইছ?'

ধনপত বলল, 'দরকার আছে। আজ ধমতোরি যাব।'

'ধমতোরি যাবে! কেন?'

'কেন আবার।' নিজের মনে কি একটু ভাবল ধনপত। তারপর বলল, 'ওখানে একটা লেড়কার (ছেলের) খোঁজ পেয়েছি। দেখে আসি লেড়কাটা কেমন?'

বিষণ্ণ একটা ছায়া পড়ল তিলিয়ার মুখে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সে। ফিসফিস করে বলল, 'কুছু ফায়দা নেই বাপু, কুছু ফায়দা নেই।'

'ফায়দা নেই!' ধনপতের গলায় বিস্ময় ফুটল, 'তুই কি বলছিস তিলিয়া!'

'ঠিক কথাই বলছি বাপুজি।' তিলিয়া বলতে লাগল, 'এর আগে কত জায়গায় তো গেলে। কত লেড়কা তো দেখলে। লেকেন—'

'কী?' তিলিয়ার মুখের দিকে তাকাল ধনপত।

তিলিয়া জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

ধনপত আবার শুধলো, 'লেকেন কী? কি রে—'

চোখ নামিয়ে অস্ফুট গলায় তিলিয়া বলল, 'কেউ কি শাদি করতে রাজী হ'ল?'

এবার রেগে উঠল ধনপত, 'উ শালেরা রাজী হয় নি বলে আর কেউ বুঝি রাজী হবে না? জরুর হবে।'

তিলিয়া জবাব দিল না।

ধনপত থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে সে, 'ধন্নতোরির এই লেড়কাটা শুনেছি বহুত ভাল। যদি ওকে পসন্দ্ হয়ে যায় এই মাহিনাতেই তোর শাদি দিয়ে দেব।'

এবারও কিছু বলল না তিলিয়া।

ধনপত তাড়া লাগাল, 'আর দেরি করিস না। খেতে দে।'

বেলা আরো বেড়েছে। সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। রোদ একটু একটু করে তীব্র এবং প্রখর হয়ে উঠেছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একসময় বেরিয়ে পড়ল ধনপত। মাথার ওপর দুপুরের আকাশটা ঝলসে যাচ্ছে। পায়ের তলায় লাল ধুলোর পথ গরম হয়ে উঠেছে। পথের দু-পাশে সীমাহীন প্রান্তর। অসহ্য রোদে প্রান্তরগুলো পুড়ে যাচ্ছে।

ঝলসানো আকাশ, তপ্ত পথ আর দগ্ধ প্রান্তর—কোনদিকে হুঁশ নেই। চলতে চলতে অদ্ভুত একটা কথা ভাবছে ধনপত। ভাবনাটা তাকে বুঁদ করে রেখেছে।

এতকাল সংসারে সে ছিল একা, একেবারে একা! বিয়ে করে নি, কাজেই বউ-ছেলেপুলেও ছিল না। ওসব যখন ছিল না, তখন ভাবনা-চিন্তাও ছিল না। তার ষাট বছরের জীবনটা ছিল একেবারে মসৃণ, একেবারে নিশ্চিন্ত।

ইদানীং মাস দুই হ'ল তিলিয়া তার কাছে আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটার যাবতীয় দায়িত্ব সে নিয়েছে।

তিলিয়ার জন্য তার ভাবনার শেষ নেই। কেমন করে মেয়েটার বিয়ে দেবে, কেমন করে তাকে সুখী করবে—এমনি নানা চিন্তায় সব সময় অস্থির হয়ে আছে ধনপত।

ঝলসানো আকাশের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধনপত ভাবল, যদি সে বিয়ে করত তিলিয়ার মত একটি মেয়ে থাকা বিচিত্র ছিল না। নিজের সেই মেয়েটিকে নিয়েও এমনি দুশ্চিন্তাই তার হ'ত। দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে এমনি করেই তার জন্য একটি ছেলে খুঁজতে বার হ'তে হ'ত!

ধনপত ভাবল, তিলিয়া নামে সোনাছুরুদের বদনসিব মেয়েটা তার জীবনে বাপ হওয়ার স্বাদ এনে দিয়েছে।

আশ্চর্য মেয়েটা!

বার

ছকুরামের মনটা ভারি বিচিত্র। যেমন জটিল তেমনি ক্রূর।

কেউ যদি হেসেখেলে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটায়, ছকুরাম তা সহ্য করতে পারে না। তার ইচ্ছা, পৃথিবীর তাবত মানুষ একটা না একটা দুর্ভাবনা নিয়ে সব সময় তটস্থ থাকুক।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যদি অতিষ্ঠ করতে পারত, ছকুরাম খুশী হ'ত। কিন্তু তার একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই সে ঠিক করেছে, যেখানেই যাবে এবং যতগুলি লোকের ওপর পারবে একটা করে দুশ্চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবন দুবিষহ করে তুলবে।

এই ছোট্ট আভনপুরের কথাই ধরা যাক। এখানে ছোট-বড়-মাঝারি, সব মিলিয়ে প্রায় চার শ দোকানদার। তার মধ্যে দেড় শ জন ছকুরামের খাতক। সুদের ভাবনায় সারা বছর তারা উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু বাকি আড়াই শ জন ছকুরামকে গ্রাহ্যই করে না। তাদের জীবনে যেন কোন ভাবনাই নেই। সব রকমের উদ্বেগ থেকে তারা মুক্ত।

এই আড়াই শ দোকানদারের কথা যতবার ভেবেছে ততবারই অস্থির হয়ে উঠেছে ছকুরাম। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, যেমন করে হোক তাদের কিছু কিছু টাকা গছাবে।

ছকুরাম জানে, যে মানুষ একবার হাত পেতে ধার নেয়, সে-ই মরে। ধারই শুধু নয়, সেই সঙ্গে অন্তহীন দুশ্চিন্তাও সে নেয়। দুশ্চিন্তা কেননা ধারের টাকা তাকে শোধ করতে হবে নতুবা বছর বছর সুদের কড়ি গুনে যেতে হবে। ভাবনায় ভাবনায় তার জীবন থেকে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, সুখ—সব কিছু উধাও হয়।

মানুষের চিন্তাগ্রস্ত নিরানন্দ চেহারা দেখতে ছকুরাম ভালবাসে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আভনপুর চলে আসে ছকুরাম। এসেই ফিতুর্‌কে নিয়ে পাওনা আদায় করতে বেরোয়। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

যথারীতি আজও আভনপুর এল ছকুরাম। হাটের চালায় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ফিতুর্।

টাঙা থেকে নেমে ছকুরাম বলল, 'আজ আর পুরানা দেনাদারদের কাছে যাব না।'

'কী করবি তা হলে?' উৎসুক চোখে ফিতুর্ তাকাল।

'নয়া দেনদার খুঁজতে যাব।'

'চল্—' ফিতুর্ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

হিসেবের খাতা, টাকা এবং ফিতুর্‌কে সঙ্গে নিয়ে নতুন খাতকের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ছকুরাম।

প্রথমেই তারা কান্তিভাইজির গদিতে গেল। গদিটা বতিয়া নদীর পারে।

কান্তিভাইজি গুজরাতি শেঠ। প্রতি বছর মরসুম পড়লেই আভনপুর আসে। এখান থেকে আমলকি-হর্তুকি-বহেড়া-মধু-মোম—এমনি নানা জিনিস কলকাতায় চালান দেয়।

পরনে তার ধুতি আর বাফতার কোট। পায়ে নাগরা। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক। কানে সোনার মাকড়ি।

বয়স কত হবে কান্তিভাইজির? খুব বেশি হলে তিরিশ কি পঁয়তিরিশ, ছকুরামেরই সমবয়সী। বেশ সুদর্শন চেহারা। চেহারাই শুধু সুন্দর না, ব্যবহারও তার চমৎকার। মানুষ হিসেবে কান্তিভাইজি ভারি মনোহর।

ছকুরামকে দেখেই কান্তিভাইজি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আইয়ে আইয়ে অন্দর আইয়ে—'

ছকুরাম আর ফিতু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকামাত্র গদির ভেতর এসে বসল।

কান্তিভাইজি শুধলো, 'তারপর কী মনে করে ছকুয়াজি?'

ছকুরাম বলল, 'খবর নিতে এলাম।'

'কী খবর?'

'রুপেয়া-উপেয়ার কুছু দরকার আছে কি-না—'

ছকুরামের মতলব বুঝতে পারল কান্তিভাইজি। বলল, 'এ বার নিয়ে পাঁচ সাল আপনি আমার কাছে ঘুরছেন। লেকেন বেফায়দা। আপনাকে তো আগেই বলে দিয়েছি কারো কাছ থেকে করজ (ঋণ) আমি নিই না। করজ বহুত বুরা (খারাপ) চীজ।'

ছকুরাম বলল, 'ব্যাওসা (ব্যবসা) করতে গেলে অনেক সময় করজ দরকার হয় তো। সব সময় তো রুপেয়া হাতে থাকে না।'

'রুপেয়া না থাকলে ব্যাওসা তুলে দেব। তবু করজ করব না। আমাকে মাপ করুন ছকুরামজি।' দুই হাত জোড় করে কান্তিভাইজি হাসল।

অগত্যা নিরাশ হয়েই ছকুরামকে উঠতে হ'ল। তার সঙ্গে ফিতুও উঠল।

কান্তিভাইজির গদি থেকে বেরিয়ে সোজা কমলাপতের কাছে এল ছকুরাম।

কমলাপত স্থানীয় লোক। তার কাপড়ের দোকান। আচারে ব্যবহারে এবং চেহারায় সে কান্তিভাইজির বিপরীত।

পরনে খাটো ধুতি আর ময়লা ফতুয়া। খালি পা। গায়ের রঙ

পোড়া তামার মত। মাথাটা প্রায় মুড়নো। থ্যাবড়া নাকের দু-পাশে একজোড়া প্রখর চোখ। প্রকাণ্ড শরীরটা থলথলে এবং রোমশ। কমলাপাতের চেহারাটাই এমন যা দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করে নেওয়া যায়।

ছকুরামকে দেখামাত্র খেঁকিকে উঠল কমলাপত, 'দশ সাল ধরে তুমহাকে বলে আসছি, আমার দুকানে আসবে না। করজের দরকার নেই আমার। যাও, ভাগো—'

ছকুরামকে দোকানের মধ্যে ঢুকতেই দিল না সে। রাস্তা থেকেই তাড়িয়ে দিল।

কমলাপতের কাছে থেকে কাশ্মীরী শেঠ শিউপুরীর দোকানে গেল ছকুরাম। সেখানেও সুবিধা হ'ল না। তারপর গেল পাঞ্জাবী শেঠ কর্তার সিং-এর কাছে। কর্তার সিং-এর পর রোশনলাল। রোশনলালের পর কিলাচাঁদ। কিলাচাঁদের পর মহীন্দরপ্রসাদ। একে একে আড়াই শ দোকানদারের কাছে ঘুরল ছকুরাম। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই তার বৃথা হ'ল। কান্তিভাইজির মত কেউ তাকে ভাল কথায় বিদায় করল। কেউ কমলাপতের মত রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু একটা পয়সা কর্জও তারা নিল না। নিতান্ত নিতান্ত বিপদে না পড়লে কেউ কি ধার নেয়।

বিকেলবেলা ক্লান্ত হয়ে নিজের চালাটিতে ফিরে এল ছকুরাম। সে ক্লান্ত হয়েছে কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ে নি। মনে মনে সে ভাবল, বার বার ওই আড়াই শ দোকানদারের কাছে যাবে। টাকা বলে কথা! এ বছর তারা হয়ত লোভ সামলেছে। কিন্তু আসছে বছর? কিংবা তার পরের বছর? কিংবা তারও পরের বছর? একদিন না একদিন লুব্ধ হয়ে তারা হাত বাড়াবেই। সেদিন তাদের কবলিত করবে ছকুরাম।

ছকুরামের জন্য অনেক কিছু করেছে তিলিয়া। চানের জল তুলে দেওয়া থেকে তরকারীতে স্বাদ এনে দেওয়া পর্যন্ত অনেক কিছু। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট রইল না। আরো অনেকদূর এগিয়ে গেল।

আভনপুর থেকে বেশ খানিকটা রাত করেই একদিন বাড়ি ফিরল ছকুরাম। অন্য দিন সন্ধের আগেই ফিরে আসে সে। আজ কাজ সারতে দেরি হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে দেখল, এককোণে হ্যারিকেনটা নিবু নিবু হয়ে আছে। (রোজই সে আসার আগে তার হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে রেখে যায় তিলিয়া।) চাবি ঘুরিয়ে আলোটার তেজ বাড়াল ছকুরাম।

আজ সারা দিন আভনপুরে ভয়ানক খাটুনি গেছে। এই মরসুমে এখানে এসে এত পরিশ্রম আর করে নি সে। বসে বসে অনেকক্ষণ জিরোল ছকুরাম। তারপর উঠে কুয়োর পারে চলে গেল। যথারীতি মাটির গাগরায় জল তোলা রয়েছে।

চান সেরে একসময় ঘরে এল ছকুরাম। কোন রকম চুলটা আঁচড়ে নিল। এবার রান্নাবান্নার পালা।

কিন্তু শরীরটা এত শ্রান্ত যে কিছু করার মত উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। এখন নিজেকে বিছানায় সঁপে দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। ছকুরাম একবার ভাবল, আজ আর রাঁধবে না। পরমুহূর্তেই তার খেয়াল হল, সাঙ্ঘাতিক খিদে পেয়েছে। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

আগের সিদ্ধান্তটা বাতিল করে ছকুরাম এবার ঠিক করল, রাঁধবে।

রাঁধতে গিয়ে কিন্তু ছকুরামকে অবাক হতে হল।

অন্য অন্য দিন আটা মেখে বেলে রেখে দেয় তিলিয়া। আলু কুটে

ধুয়ে রাখে। এ একেবারে নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ কিন্তু নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটেছে। রান্নার কোন ব্যবস্থাই করা নেই।

ছকুরাম ভাবল, ব্যবস্থা করতে হয়ত ভুলে গেছে তিলিয়া। একটুক্ষণ বসে রইল সে। তারপর উঠে নিজেই আটা-আলু এবং মশলা বার করতে গেল।

সবেমাত্র আটার বস্তায় হাত দিয়েছে ছকুরাম, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, 'ছকুয়াজি—'

ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। ছকুরাম দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিলিয়া।

তিলিয়া শুধলো, 'কী করছ?'

ছকুরাম বলল, 'কি আবার করব! আটা আর আলু বার করছি।'

'ও সব বার করতে হবে না।'

'কেন?' ছকুরামের গলাটা ঈষৎ রুক্ষ শোনাল।

একটু ইতস্তত করল তিলিয়া। তারপর বলল, আভনপুর থেকে তুমহার আসতে দেরি হচ্ছিল তাই—'

'তাই কী হয়েছে?'

একটা ঢোক গিলল তিলিয়া। ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমহার রোটি ঔর ভাজি আমি বানিয়ে রেখেছি।'

অন্য সময় হ'লে কি হত, বলা যায় না। হয়ত রেগে উঠত ছকুরাম। কিন্তু শরীরের এখন যা অবস্থা তাতে রাগ করার মত প্রচুর সামর্থ নেই। একদৃষ্টে তিলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

চুপচাপ খানিকটা সময় কেটে গেল।

এর মধ্যে কি যেন ভেবে নিয়েছে তিলিয়া। খুব মৃদু এবং ম্লান গলায় সে বলল, 'তুমি বামহন আর আমি সোনাহুরু। তুমি কি আমার হাতে খাবে ছকুয়াজি?'

'জাত-টাত আমি মানি না।' ছকুরাম বলল।

'তা হলে খেতে দোব?' তিলিয়া উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ছকুরাম জবাব দিল না।

তিলিয়াও আর কিছু বলল না। চটের একটা আসন পেতে ছকুরামকে খেতে দিল।

শরীরের কথা ভেবে ছকুরাম ঠিক করল, আজকের দিনটাই শুধু তিলিয়ার হাতে খাবে। কাল থেকে যথারীতি নিজের রুটি নিজেই বানিয়ে নেবে।

খেতে বসে ছকুরাম দেখল, শুধু রুটি আর ভাজিই না, একবাটি অড়হরের ডালও পাতের সামনে সাজানো রয়েছে। খেতে খেতে তার মনে হ'ল, এমন যত্ন করে কেউ কোনদিন তাকে খাওয়ায় নি। জীবনের সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত –

ছকুরামের ভাবনাটা আর এগুলো না। একপাশে চুপ করে বসে ছিল তিলিয়া। হঠাৎ ডেকে উঠল সে, 'ছকুয়াজি—'

'বল—' ছকুরাম মুখ তুলল।

'একটা বাত—'

'কী ?'

'রোজ রোজ দেখি আভনপুর থেকে তুমি কত হায়রান হয়ে আস। সেখানে পুরা দিন তুমহার কত খাটুনি যায়। তারপর এখানে এসে রোটি বানাও। এ আমার ভাল লাগে না।' তিলিয়া বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে—'

'কী ইচ্ছে ?'

'কাল থেকে তুমহার জন্যে রেঁধে রাখব।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না ছকুরাম। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমার চানের জন্যে পানিয়া তুলে রাখছ, রান্নার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছ, তার ওপর আবার রেঁধে দিতে চাইছ। কী জন্যে এত সব করছ ?'

তিলিয়া জবাব দিল না। কেন যে সে এ-সব করছে কেমন করে বোঝাবে। এ তার প্রাণের লীলা। মুখ নামিয়ে নখ দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সে।

ছকুরাম আবার শুধলো, 'এ সব করে তোমার কী লাভ ?'

এবার মুখ খুলল তিলিয়া, 'লাভ-লুকসান বুঝি না।'

'তবে ?'

'আমার ইচ্ছা হয়, তাই করি।' তিলিয়া বলল, 'কাল থেকে রেঁধে রাখব কিন্তু।'

ছকুরাম আর কিছু বলল না। বলে লাভও নেই। প্রায় দিন কুড়ি হ'ল, সে এখানে এসেছে। এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছে, রাগ উদাসীনতা উপেক্ষা—কোন কিছু দিয়েই তিলিয়াকে ঠেকানো যাবে না। সোনাছকুদের এই মেয়েটা নিজের খুশিমত তো চলবেই। অন্যকেও তার ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য করবে।

চোদ্দ

অনেক আশা নিয়ে সেদিন ধমতোরি গিয়েছিল ধনপত। কিন্তু নিরাশ হয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে।

ধমতোরির ছেলেটার নাম লাখন। তার বাপ হরকিষণ। তিলিয়া সম্বন্ধে সব কথা শুনে হরকিষণ ক্ষেপে উঠেছিল। বলেছিল, 'তুমি কি আমার সাথ দিল্লেগি করতে এসেছ !'

'দিল্লেগি ! কী বলছ হরকিষণজি !' থতমত খেয়ে গিয়েছিল ধনপত।

'ঠিকই বলছি।'

'কি রকম ?'

'অই নাপাক (অপয়া) লেড়কিটাকে তুমি আমার ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছ ! দিল্লেগি ছাড়া এ আর কী !'

'না-না, তিলিয়া নাপাক না।' গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ধনপত বলেছিল।

'যে লেড়কির শাদি একবার ভেঙে গেছে সে নাপাক না ! নাপাক না হলে ওর চাচা ওকে তাড়াত ?' বিস্মিত এবং রুষ্ট মুখে প্রশ্ন করেছিল হরকিষণ।

'দ্যাখো হরকিষণজি, ভগোয়ানের ইচ্ছা ছিল না, তিলিয়ার শাদিটা তাই ভেঙে গেছে। আর তাড়াবার কথা বলছ? শাদি না ভাঙলেও ওর চাচা ওকে তাড়াত। শাদিটা ভেঙে যেতে সুবিধেই হয়েছে। অই ছুতোতে তাড়াতাড়ি ভাগাতে পেরেছে।' খুব আস্তে আস্তে কথা ক'টা বলেছিল ধনপত।

হরকিষণ জবাব দেয় নি। একদৃষ্টে ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ধনপত থামে নি, 'তিন মাহিনা লেড়কিটা আমার কাছে আছে। মেয়ে তো না, ও হ'ল লছমী। যে ঘরে যাবে সে ঘর রোশনি হয়ে উঠবে।'

অনেক বুঝিয়েছিল ধনপত। হরকিষণ কিন্তু বোঝে নি। বুঝবার মত শিক্ষা-দীক্ষা বা মানসিক প্রশস্ততা কোনটাই তার নেই। বিয়ে-ভেঙে-যাওয়া মেয়েদের সম্পর্কে সোনাহুরু সমাজে যে অন্ধ সংস্কার আছে সেটা ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না।

প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে হরকিষণ মানুষ। তার জীবনের মূল শিকড়টি রয়েছে প্রাচীন সংস্কারগুলির গভীরে। এই বুড়ো বয়সে হঠাৎ পুরনো বিশ্বাস আর সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে তিলিয়ার মত মেয়েকে সে যে ছেলের বৌ করে নেবে, তা নিতান্তই দুরাশা। কাজেই হতাশ হয়ে ধনপতকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

ধমতোরি থেকে ফিরে কয়েকটা দিন খুবই বিমর্ষ হয়ে আছে ধনপত। কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু হরকিষণের কাছেই না, মধ্যপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেখানে যত সোনাহুরু আছে সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়িয়েছে সে। অকপটে তিলিয়ার কথা বলেছে। তার ধারণা ছিল, দুঃখী মেয়েটার কথা যে শুনবে সে-ই অভিভূত হবে। কিন্তু ফল হয়েছে একেবারে বিপরীত। অভিভূত তো কেউ হয়ই নি, বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যে মেয়ের বিয়ে একবার ভেঙে গেছে তার জন্য কোথাও এতটুকু সহানুভূতি বা উদারতা নেই।

তার কাছে সব ঘরের দুয়ারই বন্ধ।

তিলিয়ার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ধনপত যেখানেই গেছে সেখানেই তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। যতই অপমানিত হোক তিলিয়ার প্রতি তার দায়িত্ব আছে। তাকে সে আশ্রয় দিয়েছে। ন্যায়ত এবং ধর্মত তার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া কর্তব্য।

কর্তব্য তো, কিন্তু কি করতে পারে ধনপত? পৃথিবীটা যেখানে এত বিমুখ আর এত অনুদার, যেখানে মানুষগুলো তাদের অন্ধ সংস্কার নিয়ে বদ্ধদ্বার, সেখানে হয়ত বা কিছুই করা যায় না।

ইদানাং কয়েকদিন ধরেই ধনপত ভাবছে, দিন দিন সে আরো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শরীরটা আরো অশক্ত আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। ক'দিনই বা সে আর বাঁচবে! ক'দিনই বা আর তিলিয়াকে আগলে রাখতে পারবে? বেঁচে থাকতে থাকতে তিলিয়ার কোন ব্যবস্থাই করে যেতে পারল না। হঠাৎ যদি সে একদিন মরে যায়, এই বদনসিব মেয়েটার কী গতি হবে? কে তাকে দেখবে? কে আশ্রয় দেবে?

অনেকে ধনপতকে পরামর্শ দিয়েছিল, হয় তিলিয়াকে তার চাচার কাছে পাঠিয়ে দাও, নয়তো কেশকাল পাহাড়ের নীচে পাদ্রি সাহেবরা যে আশ্রম খুলেছে সেখানে দিয়ে এস। কিন্তু কোনটাই তার মনঃপূত হয় নি। সে চেয়েছিল তিলিয়াকে তার জাতের ঘরে একটি ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিতে।

কিন্তু না, ভাল হোক মন্দ হোক সৎ হোক অসৎ হোক একটি ছেলেও জোগাড় করতে পারল না ধনপত। এখন তিলিয়াকে নিয়ে সে কী করবে?

ভেবে ভেবে ধনপত যখন দিশেহারা, ঠিক সেই সময় পড়শী সখিলালের কথা মনে পড়ল তার।

সখিলাল গোরীগাঁওয়ের সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। শুধু প্রাচীনই না, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণও। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তার বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা। প্রথম যৌবনে জীবিকার ধান্দায় নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে সে। কোথায় সেই হরিদ্বার, কোথায় সুদূর আসাম, কোথায় বোম্বাই

আর শিবকাশী—ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গায় তাকে ভেসে বেড়াতে হয়েছে। দেশই শুধু ঘোরে নি সে, মানুষও দেখেছে। অনেক অজস্র বিচিত্র আর অদ্ভুত সব মানুষ।

নানা দেশ ঘুরে আর নানা মানুষের সংস্রবে এসে জীবন সম্পর্কে একটা নির্ভুল ধারণা করে ফেলেছে সখিলাল।

ধনপত ভাবল, সখিলালের কাছে গেলে সুরাহা হবে। তিলিয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। (এই গ্রামের সবাই বিপদে পড়লে তার কাছে পরামর্শের জন্য যায়।) ধনপত ভাবল বটে, পর মুহূর্তেই কিন্তু তার মনে পড়ল, পনের বছর ধরে দেড় বিঘে জমি নিয়ে সখিলালের সঙ্গে মামলা চলছে।

মামলার কথাটা মনে পড়তেই কেমন যেন বিব্রত বোধ করল ধনপত। জমি নিয়ে যার সঙ্গে শত্রুতা চলছে, পরামর্শের জন্য তার কাছে যাওয়া উচিত হবে কি? দ্বিধায় ধনপতের মনটা দুলল অনেকক্ষণ।

দ্বিধাগ্রস্ত বিব্রত ভাবটা একসময় কাটিয়ে উঠল সে। ভাবল, মামলা হচ্ছে জমি নিয়ে। তার সঙ্গে তিলিয়ার কোন সম্পর্কই নেই। ধনপত স্থির করল, সুবিধামত একদিন সখিলালের কাছে যাবে। দেখাই যাক না, সে কি বলে।

দেখতে দেখতে পৌষমাস এসে গেল।

হিসেব অনুযায়ী এটা পঞ্চম ঋতু অর্থাৎ শীত। মধ্যপ্রদেশে বছরের এই ঋতুটি রীতিমত ঘটা করে আসে।

এ সময় বস্তার জেলার শালবনে পাতা ঝরতে শুরু হয়ে গেছে। ক'দিন আগেও পাখিতে পাখিতে আকাশটা জমকালো হয়ে ছিল। এখন কোথাও একটা পাখিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পৌষ মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফেরারী হয়েছে।

বাতাসটা ভারী আর হিমাক্ত হয়ে উঠেছে। রোদের তেজ মরে যাওয়ায় দিনগুলো এখন বিবর্ণ, নিরানন্দ, ম্রিয়মাণ। শুধু চারপাশের

প্রকৃতিই না, এই ঋতুটা মানুষকেও প্রভাবিত করেছে। সেদিনও যে মানুষগুলো অফুরন্ত উৎসাহে জমি কোপাত, ভঁইসের গাড়ি চালাত কিংবা শুধুমাত্র দু-পায়ের ওপর ভরসা করে দেড়শ মাইল দূরের জগদলপুর শহরে পাড়ি জমাত, তারাই এখন জবু-থবু আর নিরুত্তম হয়ে পড়েছে।

শীতের এই ঋতুতে মধ্যপ্রদেশ কেমন যেন তাপহীন, নিষ্ক্রিয় আর জড়ত্বময়।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গায়ে একখানা ময়লা কম্বল জড়িয়ে সখিলালের বাড়ি রওনা হ'ল ধনপত।

গোরীগাঁও-এর একপ্রান্তে ধনপতের ডেরা, আরেক প্রান্তে সখিলালের। লাল ধুলোর আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে ধনপত যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। রোদ উঠে গেছে। তবে রোদটা এত নিস্তেজ যে মধ্যপ্রদেশের শীতল মাটিকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে নি।

সখিলালের ডেরাটা বিশেষত্ব বর্জিত। অনেকটা ধনপতেরই মত। সারি সারি কয়েকটা মাটির স্তূপ, ওপরে টিনের চাল, বেঁটে বেঁটে দরজা, জানালার বালাই নেই। সামনের দিকে সামান্য উঠান। উঠানটাকে ঘিরে অনেকগুলো ঝুমরু ফুলের গাছ। শীতের মরসুমে যখন সব গাছ পাতা আর ফুল ঝরে নিঃস্ব হয়ে যায় তখন ঝুমরু গাছের ডালে পাতা আসে, কুঁড়ি ধরে। এমন কি হলুদ রঙের রাশি রাশি ফুলও ফোটে।

ফুলে ফুলে সখিলালের উঠানটা আলো হয়ে আছে।

একটু ইতস্তত করল ধনপত? পুরনো সেই দ্বিধাটা মুহূর্তের জন্য তাকে বিচলিত করল। সখিলালের বাড়িতে ঢুকবে কি ঢুকবে না যখন ভাবছে, সেই সময় সর্দিবসা চাপা গলাটা শোনা গেল, 'কোন রে, উঁহু কৌন—'

ধনপত চমকে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি—'

'আমি কৌন?' গলাটা আবার শোনা গেল।

ধনপত সাড়া দিল, 'ধনপত।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তার পরেই মাটির স্তূপগুলোর ভেতর থেকে একটা বুড়ো মানুষ বেরিয়ে এল। পরনে সাবানে-কাচা পরিষ্কার ধুতি। গায়ে সাদা ধবধবে একটা কামিজ আর তুসের চাদর। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা।

যথেষ্ট বয়েস হয়েছে লোকটার। অসংখ্য কুঞ্চনে মুখটা জটিল। পাকা রোমশ ভুরু দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ফলে চোখজোড়া প্রায় ঢাকা। সবচেয়ে অদ্ভুত হ'ল তার মেরুদণ্ড। এত বয়সেও সেটা ঋজু, সবল এবং খাড়া।

লোকটা তাকাবার চেষ্টা করল। ভুরু দুটো সরে গিয়ে তার দৃষ্টিকে পথ করে দিল। সে বলল, 'তু ধনপত!' গলার স্বরে কেমন যেন ঢেউ খেলে গেল তার।

বিব্রত, একটু বা ভীত গলায় ধনপত বলল, 'হাঁ আমি, সখি ভেইয়া—'

বোঝা গেল, এই লোকটাই সখিলাল। সে শুধলো, 'এখানে কোথায় এসেছিস?'

'তুমহার কাছে।' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল ধনপত।

'আমার কাছে এসেছিস তো বাহার দাঁড়িয়ে আছিস যে?'

'অন্দর যেতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।'

'কেন?'

কি একটু চিন্তা করল ধনপত। তারপর বলল, 'তুমহার সাথ আমার মামলা চলছে! তাই—' কথাটা পুরো না করেই হঠাৎ সে থেমে গেল।

'তাই কী?' সখিলাল কাছে এগিয়ে এল।

'তাই ভাবছিলাম, তুমহার কাছে গেলে তুমি যদি ক্ষেপে ওঠ।' ধনপত ফিস ফিস করল।

'আরে নালায়েক বুদ্ধু, মামলা হচ্ছে আদালতে। হারজিত—ফয়সালা যা হবার সেখানেই হবে। মামলা হচ্ছে বলে তুই আমার

কোঠির বাহার এসে দাঁড়িয়ে থাকবি ! আ, অন্দর আ—' ধনপতের হাত ধরে একরকম টানতে টানতে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল সখিলাল।

ভেতরে ঢুকেই গলা চড়িয়ে সে ডাকল, 'এ লছমীকি মাঈ—'

সারি সারি যে মাটির ঢিবিগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কোন একটার মধ্য থেকে সাড়া এল, 'হাঁ—'

'বাহর আয় বুড্‌ঢি। দেখে যা, কে এসেছে।'

লছমীর মা অর্থাৎ সখিলালের বউ বাইরে বেরিয়ে এল। বুড়ির প্রচুর বয়স। গায়ের চামড়া শিথিল এবং যথানিয়মেই কোঁচকানো। চোখের দৃষ্টি প্রায় অথর্ব। মাথার চুল সমস্তই পেকে গেছে। এত যে বয়েস তবু সখিলালের বুড়ি বউয়ের প্রাণে কোথাও যেন সৌখিনতার একটু অবকাশ আছে। এত সকালেও বেশ পরিপাটি করে পাকা চুল আঁচড়েছে সে। মেটে সিঁদুরে কপাল আর সিঁথি ডগডগে। বুড়ির দু-হাতে রুপোর কাঙনা আর গোছা গোছা গালার চুড়ি। পায়ে চুটকি এবং নাকে সোনার নথ। হাতের ঢিলে চামড়ায় রামসীতার যুগলমূর্তির উল্কি।

বুড়ি শুধলো, 'কে, কে এসেছে ?'

'আমাদের ধনপত—' সখিলাল বলতে লাগল, 'উল্লুটা কোঠির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্দর আসতে শরমাচ্ছিল (লজ্জা পাচ্ছিল)।'

'কেন ?'

'কেন আবার। ওর সাথ মামলা হচ্ছে তাই। ওটা একটা বুদ্ধু।'

বুড়ি কিছু বলল না।

সখিলাল থামে নি, 'যা বুড্‌ঢি, এত বরষ পর ধনপত আমার কোঠিতে এল। ওকে কুছ খেতে দে।'

বুড়ি মাটির ঢিবিগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ধনপতকে সঙ্গে করে দাওয়ায় গিয়ে বসল সখিলাল।

বসে বসে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ধনপত। পনের বছর আগে যেদিন সখিলালের সঙ্গে তার মামলা শুরু হয়, তারপর থেকে এ

বাড়িতে সে আর আসে নি। কিছুক্ষণ আগে যখন সে এই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখনও তার ধারণা ছিল না সখিলালের কাছ থেকে কি ধরনের ব্যবহার পাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সখিলালের আন্তরিকতা এবং আপ্যায়নে সে বিস্মিত, কিছুটা বা সন্দিগ্ধ। এমনটা সে প্রত্যাশা করে নি। সখিলালের মনে কি আছে, কে জানে!

'সখিলাল ডাকল, 'ধনপত—'

'বল—' ধনপত চকিত হয়ে উঠল।

'হঠাৎ তুই আমার কাছে এলি। কুছ দরকার আছে?'

'হাঁ।'

'কী?'

'তুমহার একটা পরামর্শ চাই।'

'কী ব্যাপারে?'

'তিলিয়ার ব্যাপারে।'

'তিলিয়া কে?' সখিলাল শুধলো।

'তুমি কি কিছুই শোন নি সখি ভেইয়া?' পাল্‌টা প্রশ্ন করল ধনপত।

'কি শুনি নি?'

'তিন মাহিনা হ'ল, সোনাহুরুদের একটা লেড়কিকে আমার কাছে রেখেছি, এ সব কথা কেউ তুমহাকে বলে নি?'

'হাঁ-হাঁ, থোড়া থোড়া শুনেছিলাম বটে। তা অই লেড়কিটার নামই বুঝি তিলিয়া?

'হাঁ।'

'এবারে বল্‌ তিলিয়ার ব্যাপারে কী পরামর্শ দরকার?'

কিছুক্ষণ ভেবে ধনপত বলল, 'লেড়কিটাকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি সখি ভেইয়া।'

'কি-রকম?' সখিলালের মুখের কুঞ্চিত চামড়ায় কৌতূহল ফুটে উঠল।

'তিলিয়াকে তো রেখেছি। লেকেন আমি আর ক'দিন বল। যাট

বয়স উমর হল। কবে ফট করে একদিন মরে যাব। তারপর মেয়েটার কি যে হবে।' ধনপত বলল।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সখিলাল। কিছু বলল না।

ধনপত থামে নি, 'মেয়েটাকে নিয়ে কী করি বল তো। কী করলে ওর ভাল হবে?'

'ওর শাদি দিয়ে দে।'

'সেরকমই ইচ্ছে ছিল আমার। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'ওর শাদি একবার ভেঙে গেছে। সে জন্য ওর জাতের কেউ ওকে শাদি করতে চাইছে না।'

'তাই নাকি?

'হাঁ। বস্তার জেলায় যেখানে যত সোনাহুরু আছে সবার কাছে আমি গেছি। লেকেন তিলিয়ার জন্যে একটা লেড়কাও পাই নি। মেয়েটার বরাতে যে কি আছে!' ভারি বিষণ্ণ দেখাল ধনপতকে!

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সখিলাল। কি এক ভাবনার মধ্যে অনেকক্ষণ তলিয়ে রইল সে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'জাত মিলিয়েই যে বিয়ে দিতে হবে, এমন কিছু দায় আছে নাকি?'

'কি বলছ!' প্রায় চমকে উঠল ধনপত।

'দুসরা জাতের ভালো লেড়কা পেলে তার সাথই মেয়েটার শাদি দিয়ে দে।'

'দুসরা জাতের সাথ শাদি! তাই কখনও হয় নাকি!' বিস্মিত ধনপত সখিলালের দিকে তাকাল। ছেলে মেয়ের জাত এবং গোত্র মিলিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়, এই হ'ল চিরাচরিত নিয়ম। এই নিয়মেই ধনপত অভ্যস্ত! কিন্তু সখিলালের মুখে এই মুহূর্তে সে যা শুনল, তা যেমন অকল্পনীয় তেমনি অদ্ভুত। তার জ্ঞান বুদ্ধি এবং সংস্কার বিচলিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সখিলালের জানা শোনা আর অভিজ্ঞতার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। সে বলল, 'হবে না কেন। শহরের বাজারে গিয়ে দ্যাখ, এমন

শাদি কত হচ্ছে।'

'সচ্ বলছ।' সখিলালের কথা বিশ্বাস করতে কেন জানি ধনপতের মন সায় দেয় না।

'এক শ' বার সচ্। এই তো গেল সাল জেঠ মাসে ভিলাইতে এমন একটা শাদি হ'ল। আষাঢ় মাসে ভূপালে দশটা হ'ল আর শাভন মাসে খাস রায়পুর শহরেই তিশটা হয়ে গেল।' অসংখ্য নজির তুলে সখিলাল বলতে লাগল, 'আজকাল এমন শাদিরই রেওয়াজ হয়েছে।'

'বল কি!'

'ঠিকই বলি।'

'লেকেন—'

'কা?'

'এ শাদি সবাই মানে?'

'মানছে তো।'

'তুমি মান?' ধনপতের বিস্ময় বাড়তে বাড়তে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল।

নানা দেশ ঘুরে নানা মানুষের সংসর্গে এসে সব রকমের সঙ্কীর্ণতা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়েছে সখিলাল। সংস্কারের বাঁধনগুলি তার মন থেকে শিথিল হয়ে গেছে। জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টি এখন স্বচ্ছ, উদার। অযথা আবেগে সেটা ঝাপসা নয়। অল্প একটু হাসল সে। বলল, 'না মেনে উপায় কি। শহর-বাজারে গিয়ে ছাখ, 'লিখি-পড়ি' আদমিরা সবাই মানছে। তুই আমি না মেনে কি করতে পারি! বুঝলি ধনপত, জমানা বদলে গেছে, ছনিয়া বদলে গেছে। তুই আমি আঁখ বন্ধ করে রাখলেই কি সব থেমে যাবে। কভি নেহি।'

'লেকেন এ ঠিক না। এক জাতের সাথ তুসরা—' বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গেল ধনপত।

'কোনটা যে ঠিক আর কোনটা ঠিক না, জোর করে কে বলতে

পারে। তোর কাছে যেটা ঠিক, আরেক জনের কাছে সেটা বেঠিক। তোর কাছে যেটা আচ্ছা, আরেক জনের কাছে সেটা বুরা!' সখিলাল হাসতে লাগল।

কথাবার্তার মধ্যেই এক সময় লছমীর মা এসে পড়ল। পেতলের থালায় রুটি আলুর ছোকা আর কাঁসার বাটিতে ধূমায়িত চা নিয়ে এসেছে। দু-জনের সামনে সেগুলো নামিয়ে রেখে যেমন এসেছিল তেমনি চুপচাপ চলে গেল সে।

খেতে খেতে সখিলাল বলল, 'বাজে কথা থাক। আমি যা বলছি শোন—'

'বল—' চায়ের বাটিতে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে ধনপত মুখ তুলল।

'জাতের ঘরে ছেলে যখন পেলিই না তখন দুসরা জাতের একটা ছেলে দ্যাখ।'

'দুসরা কোন্ জাতের ছেলে দেখব? কে-ই বা তিলিয়াকে শাদি করতে রাজী হবে?'

'হবে হবে, অমন খুবসুরতি লেড়কিকে শাদি করতে অনেক লেড়কাই রাজী হবে।' সখিলাল বলতে লাগল, 'তুই যদি না পারিস, আমিই তিলিয়ার জন্য লেড়কা খুঁজে দেব।'

'তুমি খুঁজে দেবে!' চোখের দৃষ্টি সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ধনপতের।

ধনপতের চোখের দৃষ্টি বা গলার স্বর—কোনটাই খেয়াল করল না সখিলাল। নিজের মনেই বলে গেল, 'তাতে দোষের কি! একটা লেড়কা খুঁজে দিলে তুই যদি দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহা পাস, তা করব না।'

ধনপত জবাব দিল না।

সখিলাল থামে নি, 'তুই কিছু ভাবিস না যত তাড়াতাড়ি হয়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

এক সময় উঠে পড়ল ধনপত। নিজের ডেরার দিকে চলতে

চলতে সখিলালের কথাগুলো ভাবতে লাগল। নিজে উপযাচক হয়ে সখিলাল তিলিয়ার জন্য ছেলে খুঁজে দেবার ভার নিয়েছে। যার সঙ্গে পনের বছর ধরে জমি নিয়ে মামলা চলছে, আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে পরম বন্ধু হয়ে গেছে। এই বন্ধুত্ব কি একটা ভান মাত্র, এই সখ্য কি নিদারুণ কোন শত্রুতার ছদ্মবেশ ?

কথায় বলে, পরচিত অন্ধকার। বুড়ো সখিলালের মনে কী আছে, কে বলবে !

চলতে চলতে বিচিত্র এক সংশয়ে ধনপতের মনটা আছন্ন হয়ে গেল।

পনের

আভনপুর থেকে ছকুরাম ফিরে আসার আগেই আজকাল তার জন্য রান্না সেরে রাখে তিলিয়া।

যথারীতি সন্ধের মধ্যেই ছকুরাম ফেরে। ফিরে চান করেই খেতে বসে। খেতে দিতে দিতে উৎসুকভাবে নানা কথা শুধোয় তিলিয়া। ছকুরাম সম্বন্ধে তার মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা।

অথচ নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে রাজী না ছকুরাম। কেউ যদি তার কথা জানতে চায় খুবই বিব্রত বোধ করে সে। প্রকাশ্যেই অসন্তুষ্ট হয়।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন তিলিয়ার প্রশ্নের জবাবে চুপ করে থাকত ছকুরাম।

কিন্তু কাছে বসে একজন যদি অনবরত কথা বলে যায়, আরেকজন ক'দিনই বা চুপ করে থাকতে পারে ! একদিন না একদিন তাকেও মুখ খুলতেই হয়।

শেষ পর্যন্ত ছকুরামকেও খুলতে হ'ল।

একদিন তিলিয়া শুধলো, 'বাপুজির কাছে শুনেছি, তুমহার দেশ বিহার। সচ্ ?'

'হাঁ।' মাথা নেড়ে ছকুরাম সায় দিল।

'দশ সাল তুমি নাকি দেশে যাও না?'

'দশ সাল না, পুরা বিশ সাল।'

'দেশে যাও না কেন?'

'অ্যায়সাই।'

মনে মনে কি একটু ভাবে তিলিয়া। তারপর বলে, কে কে আছে তুমহার?'

'কেউ নেই। বাপ-মা-ভাই-বহেন—কেউ না!' ছকুরামের গলাটা খুব নিস্পৃহ আর হয়ত বা একটু উদাসও শোনায়. 'কোনকালে কেউ ছিলও না।'

ছকুরামের দিকে তাকিয়ে গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে তিলিয়া বলল, 'জরুর ছিল আর এখনও আছে।'

আশ্চর্য দূরগামী চোখ মেয়েটার। সেই চোখ যেন বুকের গভীর পর্যন্ত দেখতে পায়। ছকুরাম উসখুস করে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, 'আছে যে জানলে কেমন করে?'

অল্প একটু হাসল তিলিয়া। বলল, 'ত্যাখ ছকুয়াজি, তুনিয়ায় কেউ মিট্টি ফুঁড়ে আসে না। সেখানে আসতে হ'লে আর কেউ না হোক, অন্তত বাপ-মাকে থাকতেই হয়।'

ছকুরাম জবাব দিল না। চুপচাপ পাতের রুটি আর ভাজি নাড়াচাড়া করতে লাগল.

খুব গাঢ় গলায় তিলিয়া ডাকল, 'ছকুয়াজি—'

মুখ না তুলেই ছকুরাম সাড়া দিল, 'কী—'

'বাপ-মা আর যে যে আছে, সবার কথা বল।'

'তাদের কথা শুনে কোন লাভ নেই।' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল ছকুরাম.

'লাভ-নুকসান আমি বুঝব। তুমি বল।' তিলিয়া যেন জেদ ধরল।

অন্য কেউ হ'লে রাগারাগি করত ছকুরাম। কিন্তু তিলিয়া নামের এই মেয়েটি সম্বন্ধে তার মনের অগোচরে হয়ত সামান্য একটু

কোমলতা আছে। যে মানুষ অযাচিতভাবে এত সেবা করে বুঝিবা তার প্রতি সব সময় রূঢ় হওয়া যায় না।

ছকুরাম বলল, 'শুনবেই তা হ'লে—'

'হাঁ।' তিলিয়া আরো একটু কাছে এসে বসল।

ছকুরাম শুরু করল, 'তুনিয়ার আর সবার মতই আমিও বাপ-মা ছাড়া না। আমার মা-ও ছিল, বাপও ছিল। যদি তারা না থাকত, আমাকে তুনিয়ায় আসতে হ'ত না। আমি বেঁচে যেতাম।'

'কী বলছ!' তিলিয়া আঁতকে উঠল।

'ঠিকই বলছি।' গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনাল ছকুরামের। হ্যারিকেনের উগ্র আলো পড়েছে তার মুখের ওপর। মুখটা আদিম কোন জন্তুর মত হিংস্র মনে হচ্ছে। চোখের দৃষ্টি ঝকমক করছে।

'ঠিকই বলছ!' তিলিয়ার বিস্ময় এখনও কাটে নি।

'জরুর।' ছকুরাম প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আগে আমার সব কথা শুনে নাও। তারপর সমঝাবে ঠিক বলেছি না বেঠিক বলেছি। অই যে আমার মা—'

'তোমার মা কী?'

'আমার মা, আমার মা—' একবার মাত্র দ্বিধা হ'ল ছকুরামের। তারপরেই স্থির, অবিচলিত গলায় সে বলে উঠল, 'আমার মা আমার বাপের শাদি করা বউ না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল তিলিয়া।

'বাপ আর মায়ের জাতও আলাদা। বাপ মৈথিলি বামহন আর মা বাদিয়ার মেয়ে—'

'তু-জনের মধ্যে—' কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল তিলিয়া।

যে কথাটা তিলিয়া অস্ফুট রেখেছে, বুঝিবা সেটা আন্দাজ করে নিল ছকুরাম। বলল, 'শুনেছি তু-জনের মধ্যে মহব্বত হয়েছিল। আর সেই মহব্বতের ফল হলাম আমি। লেকেন তাতে কী হ'ল?

আমি জন্মে ছুনিয়ার কোন উপকারে লাগলাম। তার চেয়ে যদি না জন্মাতাম—হা ভগোয়ান—'

'তুমি তো জন্মালে, তারপর?' কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হ'ল তিলিয়া।

'তারপর—তারপর—সে বহুত ছুখ্‌সের কথা—বহুত ছুখ্‌স। সে সে কথা আরেকদিন শুনো। আজ না।'

'আজই বল।'

'না—না।'

মুহূর্তে শামুকের মত কঠিন একটা আবরণের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল ছকুরাম। হাজার পীড়াপীড়ি করেও আর কিছুই জানা গেল না।

মুখ নামিয়ে রুটি আর ভাজি নাড়াচাড়া করছে ছকুরাম। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিলিয়ার মনে হ'ল, আপাত রূঢ় এই মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন দুর্বহ একটা দুঃখ আছে। যন্ত্রণাবিদ্ধ পশুর মত সেই অব্যক্ত অবাঙময় দুঃখটা বয়ে বয়ে ভেতরে ভেতরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কেন জানি, ছকুরামের প্রতি অপরিসীম করুণায় তিলিয়ার সমস্ত মন প্লাবিত হয়ে গেল।

* * *

আরেক দিন তিলিয়া শুধলো, 'বাপুজির কাছে শুনেছি, তুমি নাকি সুদের কারবার কর।'

ছকুরাম বলল, 'হাঁ।'

'সুদ আদায়ের জন্যে তুমি নাকি করজদারদের (খাতকদের) খুব তকলিফ দাও।'

মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে ছকুরামের। নীরস গলায় সে বলে, 'হাঁ, খুবই তকলিফ দি।'

'কেন?'

'মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই বলে—'

'কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও!' প্রায় চমকে উঠল তিলিয়া।

'হাঁ।' নিরাসক্ত মুখে জবাব দিল ছকুরাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ তিলিয়া শুধলো, 'মানুষকে কষ্ট দিয়ে কেউ কখনো আনন্দ পায় নাকি ?'

'পায় বৈকি। আর কেউ না পাক, আমি পাই।' ছকুরাম বলল।

'তুমি আমার সাথ তামাসা করছ!' একদৃষ্টে ছকুরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তিলিয়া। তার চোখে যুগপৎ সন্দেহ আর বিস্ময়।

'না না তামাসা নয় আওরত।' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ছকুরাম। বলল, 'আমার সব কথা যদি তুমি জানতে, তা হলে বুঝতে মানুষকে কষ্ট দিয়ে আমি ঠিক কাজই করি।'

'বল, তুমহার সব কথা আমাকে খুলে বল।'

'আজ না, আরেক দিন বলব।'

'আজই বল।'

'না।'

* * *

আরেকদিন তিলিয়া শুধলো, 'তুমি শাদি করেছ ?'

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মুখ তুলল ছকুরাম। তার চোখদুটো কি এক আক্রোশে ধক ধক করছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে খুব আস্তে সে বলল, 'না।'

মুখচোখের দিকে তাকিয়েই তিলিয়া বুঝতে পারল, ছকুরামের জীবনের কোন গোপন যন্ত্রণার জায়গায় নিজের অজান্তে ঘা দিয়ে বসেছে। ভাবল, ভালই করেছে। যন্ত্রণার স্বভাবই এই, বেশিদিন সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যখনই তার গায়ে হাত পড়ে, ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে।

তিলিয়ার মনে হ'ল, এবার নিজেকে নিশ্চয়ই উন্মুক্ত করে দেবে ছকুরাম। প্রচুর আগ্রহ নিয়ে ছকুরামের দিকে তাকাল সে। শুধলো, 'কত বয়স হ'ল তুমহার ?'

'তিশ পঁয়তিশ হবে।'

'এত বয়স হ'ল, এখনও শাদি কর নি কেন?'

ছকুরাম জবাব দিল না।

তিলিয়া আবার প্রশ্ন করল, 'কি চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও।'

একটু আগে ছকুরামের চোখদুটো আক্রোশে জ্বলছিল। এখন জ্বালা বা দাহ, কিছুই নেই। কেমন যেন অন্যমনস্ক আর বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। ঝাপসা গলায় সে বলল, 'শাদি যে করব, আমাকে কে মেয়ে দেবে বল?'

গলার স্বর শুনে তিলিয়া অবাক হয়ে গেল। ছকুরাম নামে এই মৈথিলী ব্রাহ্মণটাকে নিষ্ঠুর সুদজীবী হিসেবেই সবাই জানে। কিন্তু এই রূঢ় নির্মম মানুষটির প্রাণের অনেক স্তর নীচে যে অসহ্য দুঃখ মূক হয়ে আছে সে কথা তিলিয়া ছাড়া আর কে জানে!

তিলিয়া বলল, 'মেয়ে দেবার লোকের অভাব! তুমহার মত খুবসুরৎ রোজগারী লেড়কার হাতে মেয়ে দেবার জন্যে সব বাপই লেলিয়ে আছে।'

'তাই নাকি!' ম্লান একটু হাসল ছকুরাম।

'জরুর।'

'জরুর না—'

'কেন?'

কি একটু ভেবে ছকুরাম বলল, 'আমার জিন্দগীর কথা শুনলে কেউ আমার হাতে লেড়কি দেবে না বরং—'

'কী?'

'ঘেন্না করবে।'

'ঘেন্না করবে!' তিলিয়া আতকে উঠল।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ছকুরাম। ফিসফিস করে বলল, 'হুঁ।'

তিলিয়া এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন কেন তোমায় ঘেন্না করবে?'

'সে আমার বরাত। আমার জিন্দগী—'

'বল, বল তোমার জিন্দগী কী?' কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধ আর উত্তেজিত দেখাল তিলিয়াকে।

'আমার-আমার—' কি যেন বলতে চাইল ছকুরাম। পারল না। উদ্যত একটা আবেগকে অনেক কষ্টে সামলে নিল সে।

'থামলে কেন, বল-বল—' তিলিয়া তাড়া লাগাল।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ছকুরাম। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এখন থাক। যদি কোনোদিন বুঝি তুমহাকে বললে আমার ভার হাল্কা হবে, তখন বলব। জরুর বলব। ততদিন তুমহাকে সবুর করতে হবে।'

অনেক আশা করেছিল তিলিয়া। কিন্তু না, ছকুরাম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা গেল না। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, যেদিনই হোক আর যতদিনই লাগুক ছকুরামের বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেবে। দেখবে তার গহন অন্তঃপুরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।

ষোল

একদিন সকালবেলা বুড়ো সখিলাল নিজেই এসে হাজির হ'ল।

খানিকটা আগে ছকুরাম আভনপুর চলে গেছে। তিলিয়াও ঘরে নেই। খুব সম্ভব প্রতিবেশী কারো বাড়ি গেছে।

একমাত্র ধনপতই বাড়ি আছে। দাওয়ায় বসে বেশ আয়েশ করে তামাক খাচ্ছে সে। এখন, এই পৌষ মাসের সকালে তামাকের নেশাটা অমোঘ মুষ্টিযোগের মত।

অন্যদিন অবশ্য এই সকালবেলাটা তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। মোষ নিয়ে এর অনেক আগেই সে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু শরীরটা আজ বিশেষ ভাল নেই, কেমন যেন জ্বর জ্বর আর রসস্থ মনে হচ্ছে। কাজেই মোষদুটোকে কিছু শুকনো বিচালি খেতে দিয়ে বাড়িতেই থেকে গেছে সে।

সখিলালকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ধনপত, 'এসো এসো সখি ভেইয়া—'

সখিলাল দাওয়ায় এসে বসল। কাঁধে করে একটা মোটা ভারী কাঁথা এনেছিল সে। সারা গায়ে বেশ ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিল সেটা।

ধনপত শুধলো, 'এই সকালবেলা কি মনে করে—'

সদিবসা মোটা গলায় সখিলাল বলল, 'একটা খবর আছে ধনপত—'

'কী খবর ?'

'তোর কাছে যে লেড়কিটা আছে, কী যেন তার নাম ?'

'তিলিয়া—'

'হাঁ তিলিয়া।' সখিলাল বলতে লাগল, 'ঐ লেড়কিটার জন্যে একটা ভাল ছেলে পেয়েছি।'

ধনপতের মুখচোখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এই তো সেদিন তিলিয়ার ব্যাপারে সখিলালের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিল সে। এরই মধ্যে বুড়োটা একেবারে ছেলের খবর নিয়ে হাজির হয়েছে! হয়ত এ নিছকই পরোপকার। ধনপতের মন তবু বলতে লাগল, সখিলালের এত উৎসাহ ভাল না। বুড়োটা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফিকিরে আছে, কে বলবে।

সখিলাল থামেনি, 'লেড়কিটার বরাত খুব ভাল রে ধনপত—'

'কি রকম ?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশ্ন করল ধনপত।

'ওর জন্যে যে ছেলেটা জোগাড় করেছি, তার নাম জগন। জগনের মত ছেলে তামাম রায়পুর জেলায় আর একটাও পাবি না।'

'তাই নাকি ?'

'হাঁ রে, হাঁ—' বুড়ো সখিলাল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল, 'জগনের ক্ষেতি আছে বিশ বিঘা! ভঁইসা আছে আটটা আর গাই তিনটা। ক্ষেতি থেকে পুরা সালের গম পায় ওরা। আর শহরে ভঁইসা দুধ আর ঘিউ বেচে তো লাল হয়ে গেল। তবে—'

'কী ?'

'জগন এদেশের লোক না।'

'এদেশ মতলব (মানে)?'

'আমাদের এই মধ্যপ্রদেশ—'

'কোথাকার লোক ও?'

'বিহারের, তবে তিশ সাল এখানে আছে। একরকম এদেশেরই লোক হয়ে গেছে।' একটু ভেবে সখিলাল আবার শুরু করল, 'আর একটা বাত—'

'কী?' ধনপত উৎকর্ণ হ'ল।

'জগন জাতে ভূঁইহার।'

'একে বিহারী, তার ওপর দুসরা জাত। এরকম একটা লেড়কার সাথ তুমি তিলিয়ার সাদি দিতে বলছ!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখিলাল। তারপর বলল, 'তোকে তো সেদিনই বলেছি, আজকাল জাত-ফাত নিয়ে কেউ দিমাগ খারাপ করে না। শহরে-বাজারে গিয়ে দ্যাখ, অ্যামন শাদি হরবখত হচ্ছে।'

ধনপতের খুঁতখুঁতুনি কিছুতেই কাটছে না। প্রথমত, সখিলালের উদ্দেশ্য কতখানি সৎ সে সম্বন্ধে তার মনে সংশয় আছে, দ্বিতীয়ত সংস্কার। আজীবন সে দেখে আসছে, বিয়ের প্রচলন সবর্ণেই সীমাবদ্ধ। এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের যে বিয়ে হতে পারে, তার ষাট বছরের জীবনে এ একেবারে অভাবনীয়, কাজেই তার সংস্কার-বিরুদ্ধ।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে ধনপত বলল, 'তবু—'

'এর মধ্যে তবু-ফবু নেই। জগনের মত লেড়কা তুই যদি হারাস তাহ'লে পরে পস্তাতে হবে। ভেবে দ্যাখ, এই বুড্‌ঢা বয়েসে একটা লেড়কির দায় নিয়েছিস। ভগোয়ান না করে, তুই যদি আজ চোখ বুজিস কাল লেড়কিটার কী হবে? কে তাকে দেখবে? তখন মেয়েটার যদি খারাপ কিছু হয় লোকে তোর নামে থুক দেবে আর বলবে, ধনপত বুড্‌ঢা লেড়কিটার কোন গতি করে দিয়ে গেল না। গতিই যদি করে দিতে না পারবে, তা হলে বাড়িতে এনে রেখেছিল কেন?' সমানে

বকে যেতে লাগল সখিলাল।

সখিলালের কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যে কর্তব্য, সেটা প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে। বিয়ে একটা তার দিতেই হবে। মেয়েদের পক্ষে বিয়ের মত সম্মানজনক ব্যবস্থা আর নেই। কিন্তু যেখানে বিয়ের জন্য সখিলাল এত পীড়াপীড়ি করছে সেখানে ধনপতের মন সায় দিচ্ছে না। তিলিয়ার ব্যাপারে সখিলালের এত বেশী আগ্রহও ভাল লাগছে না। ধনপত চেয়েছিল, সংস্কারের বিরুদ্ধতা না করে চিরাচরিত পন্থায় স্বজাতের ঘরে তিলিয়ার বিয়ে দিতে। কিন্তু বুড়ো সখিলাল যা বলছে এবং যে সম্বন্ধে এনেছে তাতে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আড়চোখে একবার সখিলালের দিকে তাকাল ধনপত। চুপচাপ ভাবতে চেষ্টা করল, এই বুড়ো লোকটার শত্রুতা কি উপকারের ছদ্মবেশে নতুন করে আসতে চাইছে?

সখিলাল ডাকল, 'ধনপত—'

'হাঁ—' অন্যমনস্কের মত সাড়া দিল ধনপত।

'চুপ করে বসে আছিস যে!'

'ভাবছি—'

'এর ভেতর ভাবাভাবির কিছু নেই। কালই জগনের ওখানে চল। নিজের আঁখেই লেড়কাটাকে দেখে আসবি। তার ক্ষেতিবাড়ি-ভঁইসা-গাই সব দেখলে সমঝাবি, আমি বাড়িয়ে কিছু বলি নি। আমার বিশোয়াস, লেড়কাটাকে জরুর তোর পসন্দ হবে।'

'জগন থাকে কোথায়?' চিন্তিতমুখে ধনপত প্রশ্ন করল।

'ভরতপুর গাঁও-এ—'

'সে তো অনেকদূর—'

'অনেক দূর আর কোথায়! এই তো মাঝখানে পাঁচখানা গাঁও; তার পরেই ভরতপুর।'

'সে বুঝি খুব কাছে হ'ল।' ধনপত বলল। তার বলার ধরনটার সঙ্গে সামান্য একটু কৌতুক মেশানো রয়েছে।

ধনপতের কৌতুকটা গ্রাহ্যই করল না সখিলাল। সে বলল, 'তা এক কাজ কর না—'

'কী?'

'কালই জগনের ওখানে চল্।'

'কালই যেতে বলছ! অত তাড়াতাড়ি কিসের?'

'তাড়াতাড়ি না করলে অমন লেড়কাটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই বলছি কালই চল্। সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়ব, বিকেল নাগাদ ফিরে আসব।'

লেকেন—' মনের সেই সংশয়টাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না ধনপত।

'লেকেন-ফেকেন কুছ না, কাল সকালে আমি আসব। তুই তৈরি হয়ে থাকিস। আমি এসেই তোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।' ধনপতকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সখিলাল চলে গেল।

* * *

কথামত পরের দিন সকালে সখিলাল এসে হাজির।

আগের দিন সারাটা রাত ঘুমোয় নি ধনপত। সখিলালের সঙ্গে জগনকে দেখতে যাবে কি যাবে না, শুয়ে শুয়ে এই সামান্য কথাটাই ভেবেছে। কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে নি। দ্বিধায় তার মনটা শুধু দুলেছেই।

কিন্তু সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে কখন যে জামা-কাপড় পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে দাওয়ায় এসে সে বসেছিল, নিজেরই খেয়াল নেই। এ-সব সজ্ঞানে করে নি ধনপত। চেতনার অগোচরে থেকে কেউ যেন তাকে চালিত করেছে। আর নিজের অজান্তে সেইমত চলেছে সে।

ধনপতকে দেখে বেশ খুশীই হ'ল সখিলাল। যদিও দায়টা পুরোপুরি ধনপতেরই, তবু পৌষের সকালে উঠে সে যে বসে থাকবে, এতটা যেন আশা করা যায় নি।

সখিলাল বলল, 'তৈরি হয়েই আছিস দেখছি। নে, চল্—'

ধনপত কিছু বলল না। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

দু-জনে যখন ভরতপুর এসে পৌঁছল তখন দুপুর। কিছুক্ষণ আগেও শীতের রোদটা নিস্তেজ ছিল, এখন বেশ চড়ে উঠেছে। এ সময় আকাশের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

মধ্যপ্রদেশের গ্রামগুলো সবই প্রায় একই ছাঁচের, একই ধাঁচের। ভরতপুর তাদের থেকে পৃথক নয়। লাল মাটির প্রান্তর ফুঁড়ে বিক্ষিপ্ত-তাদের মতই মাথা তুলে আছে সে। রাস্তাগুলো তাদের মতই ধুলোয় ধুলোয় আচ্ছন্ন। বাড়িগুলোও হুবহু একই রকম—এলোমেলোভাবে ছড়ানো অসংখ্য ঢিবি যেন।

ধনপতকে নিয়ে সখিলাল যে বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল, সেটা কিন্তু ভরতপুরের অন্য সব বাড়ি থেকে আলাদা। তার মাথায় টিনের চাল, চারপাশে কাঠের দেওয়াল, নীচে কাঠের পাটাতন। সামনের দিকে পরিচ্ছন্ন একটু উঠান। উঠানটাকে ঘিরে তিনটে ছোট পিপুল আর পাঁচটা আমলকি গাছ। পিপুল আর আমলকীর ছায়ায় উঠোনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মধ্যপ্রদেশের সৃষ্টিছাড়া গ্রামে যেখানে মানুষের বসতি মানেই ঢিবি সেখানে এমন একখানা বাড়ি শুধু অভাবিতই নয়, চমকপ্রদও।

বিস্মিত মুগ্ধ চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ধনপত।

পাশ থেকে মোটা ভোঁতা গলায় সখিলাল বলে উঠল, 'এই হল জগন পরসাদের কোঠি।'

'অ—' অস্পষ্ট একটা শব্দ করল ধনপত।

'চল্ অন্দর যাই।'

'চলো।'

দু-জনে ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

জগন বাড়িতেই ছিল। দাওয়ার এককোণে বসে ভোতা একখানা ফালে শান দিচ্ছিল। সখিলালদের দেখে ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল সে। আপ্যায়নে মুখর হয়ে উঠল, 'আইয়ে আইয়ে সখিলালজি—'

সখিলাল আর ধনপত উঠান থেকে দাওয়ায় গিয়ে উঠল। খানদুই

বস্তা সেখানে পাতাই ছিল। দু-জনে তার ওপরে বসে পড়ল।

জগন এবার শুধলো, 'তারপর কী মনে করে সখিলালজি—'

'সেদিন তোকে যা বলে গিয়েছিলাম, সেই ব্যাপারে এসেছি।' সখিলাল বলল।

শাদির ব্যাপার তো ?' লজ্জিতমুখে প্রশ্ন করল জগন।

'হাঁ রে হাঁ—'

এরপর জগন আর কিছু বলল না। নতমুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একপাশে নিঃশব্দে বসে রয়েছে ধনপত। বসে বসে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে জগনকে দেখছে। বেশ দেখতে ছেলেটিকে। গায়ের রঙ মধ্য প্রদেশের আর সবার মতই রোদে পুড়ে তামাটে, মাথার চুল চামড়া ঘেঁসে ছোট ছোট করে ছাঁটা। চওড়া কাঁধ, পেশল ঘাড়, হাত দুটো জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে। শিরদাঁড়াটা ঋজু এবং মজবুত; দেখেই মনে হয়, অনেক ভার বহনে সে সক্ষম। অদ্ভুত তার চোখ, যেমন সরল তেমনি স্নিগ্ধ। চোখ দেখেই তার স্বভাবের প্রায় সবটুকুই জেনে ফেলা যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য তার স্বাস্থ্য। যেমন অটুট তেমনি অফুরন্ত। জগন নামে এই কান্তিমান সুপুরুষ ছেলেটিকে চোখের দেখা দেখে যতখানি বোঝা যায় তাতে মোটামুটি মন্দ লাগছে না ধনপতের। অন্তত তার চেহারায় বড়রকমের কোন খুঁতই বার করতে পারে নি সে।

স্বাস্থ্য আর চেহারা ছাড়াও আরো একটা জিনিস খুবই ভাল লেগেছে ধনপতের। সেটা হ'ল জগনের সলজ্জ নম্র ভাব। সখিলাল বিয়ের কথা বলাতে ছেলেটা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। লজ্জায় তার মুখের রঙ বদলে গেছে। ছেলেটা আর যাই হোক প্রগলভ ফাজিল নয়। এতে মনে মনে বেশ খুশীই হয়েছে ধনপত।

এতক্ষণ মুখ বুজে বসেছিল সে। এবার সখিলালের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে ফিসফিস গলায় শুধলো, 'এই বুঝি লেড়কা ?'

'হাঁ—' সংক্ষেপে জবাব সেরে জগনের দিকে তাকাল সখিলাল।

মাটিতে তেমনি চোখ রেখে অপরিসীম কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে জগন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সখিলাল ডাকল, 'জগন—'

'কহিয়ে—' খুব আস্তে সাড়া দিল জগন।

'আঁখদুটো অমন নামিয়ে রাখলে বলব কেমন করে—' সখিলাল বলল।

অগত্যা মুখ তুলতেই হ'ল জগনকে।

ধনপতকে দেখিয়ে এবার সখিলাল শুধলো, 'এ কাকে এনেছি জানিস ?'

'না।'

'এই হ'ল ধনপতজি। তোকে সেদিন এর কথা বলেছিলাম। ইয়াদ হচ্ছে ?'

জগন মাথা নেড়ে জানাল, 'হাঁ।' তারপর ধনপতের দিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে বলল, 'নমস্তে—'

ধনপত কিছুই বলল না। একদৃষ্টে জগনকে দেখতে লাগল।

সখিলাল কিন্তু থামে নি। জগনকে উদ্দেশ করে সমানে বকে যাচ্ছে, 'যে লেড়কিটার সঙ্গে তোর শাদির কথা বলতে এসেছি সে ধনপতজির বিটিয়ার মতন। শাদি হ'লে ধনপতই তোর শ্বশুর হবে। সমঝালি ?'

অস্পষ্ট জড়িত স্বরে জগন কি উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় সখিলাল বলে উঠল, 'তোর সাথ আর কিছু বলার নেই। তোর মাকে পাঠিয়ে দে।'

জগন যেন বেঁচে গেল। তাড়াতাড়ি সামনের ঘরখানায় ঢুকে পড়ল সে।

জগন চলে যাবার পর দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিল সখিলাল। যখন বুঝল কেউ কোথাও নেই তখন গলা নামিয়ে ডাকল,

'এ ধনপত—'

খুব মগ্ন হয়ে কি যেন ভাবছিল ধনপত। সখিলালের ডাকটা কানে যেতেই চমকে উঠল। বলল, 'কী বলছ ?'

'লেড়কা কেমন দেখলি, বল্‌—'

মন্দ না।'

'মন্দ না কিরে !' চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে সখিলাল বলল, 'বল্‌ বহুত আচ্ছা। অ্যামন ছেলে তিলিয়ার মত লেড়কির জন্য তুই কোথায় পাবি !'

মনে মনে সখিলালের কথাগুলো মানতেই হ'ল ধনপতকে। মুখ ফুটে সে অবশ্য কিছু বলব না।

পরম উৎসাহে সখিলাল বলতে লাগল, 'শুধু তো লেড়কা আর এই কোঠিখানা দেখেছিস। এরপর যখন লেড়কার মাকে দেখবি, ক্ষেতিবাড়ি আর ভঁইসাগুলোকে দেখবি তখন বুঝবি, আমি সচ্‌ বাতই বলেছিলাম। এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি।'

ধনপত কি যেন বলার উপক্রম করেছিল। তার আগেই একটা মৃদু কোমল স্বর শোনা গেল, 'নমস্তে—নমস্তে—'

ধনপত আর সখিলাল—যুগপৎ দু-জনে ফিরে তাকাল। দেখল, সামনের ঘরের চৌকাঠের কাছে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ দেখলে তাকে যুবতী বলেই সংশয় হবে এমনই সুগঠিত সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সমস্ত মুখে বয়স তার আঁচড় কাটতে শুরু করেছে। চোখের কোলে কালো রঙের স্থায়ী দাগ পড়েছে। খুঁজলে সিঁথির দু-পাশ থেকে কিছু কিছু পাকা চুল বার করাও দুরূহ হবে না।

যে সুন্দর স্বাস্থ্যটি কারচুপি করে তার বয়স আপাত দৃষ্টিতে অনেকখানি কমিয়ে রেখেছে, সেটাও কিন্তু পুরোপুরি নিখুঁত নয়। অযথা মেদে তার বাঁধুনি শিথিল হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোকটি আসলে যুবতী নয়, মধ্যবয়সী এবং বিধবাও। পরনে সাদা থান কাপড়। কাপড়খানা বেশ পরিষ্কার। দু-হাতে রুপোর

কাঙমা, কোমরে গুজরিপঞ্চম এবং গলায় মোটা বিছে হার। চোখদুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত। মুখখানা কিন্তু ভারি কমনীয়। সব মিলিয়ে তার কোথায় যেন দুর্লভ একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সেটা ঠিক দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়।

মধ্যপ্রদেশের সাধারণ মানুষের ঘরে রুচি শ্রী আর ব্যক্তিত্ব মিলিয়ে এমন একটা অসাধারণ স্ত্রীলোক যে থাকতে পারে, তা যেন কল্পনাই করা যায় না।

মুখের ডৌল আর স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায় এই হ'ল জগনের মা। নাম তার সুভদ্রা।

সুভদ্রা আবার বলল, 'নমস্তে—নমস্তে—'

সাখলাল আর ধনপত তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ব্যস্তভাবে তারাও বলে উঠল, 'নমস্তে—নমস্তে—'

সুভদ্রা এবার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'আপনারা এত তখলিফ করে জগনের শাদির কথা বলতে এসেছেন, এ আমার ভাগ্য। লেকেন—'

'কী?' সখিলাল শুধলো।

'অত দূর থেকে এসেছেন, এত বেলা হয়ে গেছে। তাই বলছি, শাদির কথা বলার আগে কিরপা করে যদি দুখানা শুখা চাপাটি খেয়ে নেন, তা হলে বড় খুশ হই!' সুভদ্রা বলল।

সখিলাল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'জরুর—জরুর—'

* * *

খেতে বসে কিন্তু দেখা গেল চাপাটিগুলো শুকনো তো নয়ই বরং খাঁটি ভঁয়সা ঘিয়ে ভিজে সরস আর সুরভিত হয়ে রয়েছে। পাতের চারপাশ ঘিরে সারি সারি পেতলের বাটি সাজানো। তার কোনটাতে অড়হর ডাল, কোনটাতে আলুভাজি, কোনটাতে পুদিনার চাটনি, কোনটাতে খোয়া ক্ষীর। প্রচুর আয়োজন, আর সে আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

একপাশে বসে রয়েছে সুভদ্রা। দরকার-মত চাপাটি-ভাজি দু-

জনের পাতে তুলে তুলে দিচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা চলতে লাগল।

সুভদ্রা বলল, 'আজ এমন একটা সুখের দিন। আপনারা জগনের শাদির কথা বলতে এসেছেন। জগনের বাপ আজ যদি বেঁচে থাকত, কি খুশীই না হ'ত।' শেষের দিকে গলাটা কেমন যেন ভারী হয়ে এল তার।

'ও তো ঠিক বাত।' সখিলাল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

'লেড়কার শাদি দিতে পারে নি, সেই আপসোস নিয়ে দু-সাল আগে আদমিটা মরেছে। অথচ—'

'কী ?'

'ঘরে একটা বহু আনার জন্যে সে কী না করেছে! রায়পুর জিলা, দ্রুগ জিলা, বিলাসপুর জিলা আর বস্তার জিলার যত গাঁও আর যত মানুষ আছে সবার কাছে গেছে সে। লেকেন—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুভদ্রা। তার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন অনেকগুলো স্তর ঠেলে কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল।

সুভদ্রার স্বাস্থ্য এবং রূপ দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিল ধনপত, কথা শুনে এবার চমৎকৃত হল। মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ যে এত সুন্দর কথা বলতে পারে, তার কাছে এ ছিল অকল্পিত।

সুভদ্রার শেষ কথার খেই ধরে ধনপত শুধলো, 'লেকেন কী ?'

'কিছুই লাভ হ'ল না।' সুভদ্রা বলল।

'কি-রকম ?'

'আমরা এদেশের লোক নই। আমরা বিহারী, সেই জন্য কেউ আমাদের ঘরে লেড়কি দিল না।' সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আচ্ছা, দেশ কি কারো গায়ে লেখা থাকে! তিশ সাল আমরা এখানে আছি। ধরম-করম আমাদের সবই এখানে। জনমটা অবশ্য হয় নি, মরণটা তো হবে। জগনের বাপের তো হয়েই গেছে। এতকাল থেকেও কি আমরা এদেশের লোক হতে পারি নি!'

ধনপত জবাব দিল না।

সুভদ্রা থামে নি, 'যাক ও-সব কথা। আজ বড় আনন্দের দিন। আপনারা এসেছেন। আমাদের যা-যা আছে, কোঠি-ক্ষেতি-ভঁইসা—সব দেখুন। তারপর যদি পসন্দ্ হয় আমাদের ঘরে লেড়কি দেবেন।'

একসময় খাওয়-দাওয়ার পালা চুকল।

ধনপত আর সখিলালকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গরু-মোষ, স্থাবর-অস্থাবর তাদের যা কিছু আছে সমস্তই দেখাল সুভদ্রা। কিছু গোপন করল না।

দেখেশুনে বেশ সন্তুষ্ট হ'ল ধনপত। তার মন বলল, এই রকম একটা ঘরই তিলিয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে! মেয়েটা যদি এখানে বউ হয়ে আসতে পারে, বেঁচে যাবে! শুধু বাঁচবেই না, সুখীও হবে। জন্ম মুহূর্ত্ত থেকে তিলিয়া বড় দুঃখী। এবার বুঝিবা তার সব দুঃখ ঘুচবে।

ভরতপুর আসার আগে ধনপতের মন দ্বিধায় দুলছিল। জগনরা ভিন দেশী, ভিন জাতি। তাদের ঘরে তিলিয়ার বিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে কি না, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল এ ধরনের বিয়ে সমাজবিরুদ্ধ, রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু ভরতপুর এসে জগনকে দেখে, সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলে তার খুঁতখুঁতুনি কেটে গেছে। সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হতে পেরেছে ধনপত। ঘর-দুয়ার-ক্ষেতি দেখা হ'লে সে বলল, 'আমরা তো দেখে গেলাম। এবার আপনারা গিয়ে একদিন লেড়কিকে দেখে আসুন।'

'হাঁ হাঁ, লেড়কি দেখতে জরুর যাব।' সুভদ্রা বলল।

'কবে যাবেন বলুন?'

'ঠিক করে যাব, এখনই বলতে পারছি না। তবে শিগ্‌গিরই একদিন যাব। যাবার আগে আপনাকে খবর দেব।'

'ঐ কথা রইল তা হ'লে—'

'হাঁ পাকা কথা।'

বিকেলের দিকে সুভদ্রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধনপতরা গোরীগাঁও রওনা হ'ল।

যেতে যেতে সখিলাল বলল, 'নিজের আঁখেই তো দেখলি। এবার বল্ যা বলেছিলাম সব সচ কি-না?'

'হাঁ সচ্—' অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল ধনপত।

একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল সখিলাল। বলল, 'জগনপরসাদের মা তিলিয়াকে দেখে যাক। তারপর তাড়াতাড়ি একটা দিন দেখে শাদি লাগিয়ে দে।'

'হাঁ, তাই করতে হবে।' আগের মতই বলল ধনপত। তার মনটা যেন সখিলালের কথায় নেই। নেহাত কথার পিঠে কথা জোগাতে হয়, তাই সে জবাব দিচ্ছে, নতুবা মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায় এখন কিছু বলার মত ইচ্ছা বা উদ্যম কোনটাই ধনপতের নেই। এই মুহূর্তে তার মনের গভীরে একটা অব্যক্ত ভাবনার লীলা চলছে। আর তাতেই মগ্ন হয়ে আছে সে।

অনেকক্ষণ চলার পর সখিলাল হঠাৎ ডাকল, 'এ ধনপত—'

ধনপত চমকে উঠল। তারপর চকিত হয়ে মুখ ফেরাল। বলল, 'কী বলছ?'

কিছু একটা বলার উপক্রম করল সখিলাল, পরমুহূর্তেই কি ভেবে সেটা আর বলল না। চুপচাপ ধনপতের পাশাপাশি চলতে লাগল।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল ধনপত। বলল, 'কই, কুছ বলছ না যে—'

'এখন থাক। আগে জগন পরসাদের মা তিলিয়াকে দেখে যাক। তারপর বলব।' খুব আস্তে কথা ক'টা বলল সখিলাল।

'এখন বলতে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা কুছু নেই।'

'তবে?'

'দুটো দিন সবুর কর না। তারপরেই তো জানতে পারবি।'

অনেক পীড়াপীড়ি করল ধনপত। কিন্তু কোন লাভই হ'ল না। সখিলাল কিছুতেই কথাটা বলল না।

পাশাপাশি হেঁটে চলেছে সখিলাল। তার মুখের দিকে তাকাল ধনপত। মুখটা ভয়ানক চতুর আর ধূর্ত মনে হতে লাগল।

জগনদের বাড়ি থেকে বেরুবার পর যে ভাবনাটা ধনপতকে অন্যমনস্ক মগ্ন করে রেখেছিল সেটা সখিলালেরই ভাবনা।

তিলিয়ার এই বিয়ে সম্পর্কে তার মনে একটা দ্বিধা আর একটা সংশয় ছিল। জগনদের দেখে দ্বিধাটা কেটেছে। কিন্তু সংশয়টা কিছুতেই ঘুচছে না। বরং সখিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা বেড়েই চলেছে।

সে কিছুতেই বুঝে উঠেছে পারছে না, কোন স্বার্থে কী মতলবে সখিলাল তিলিয়ার বিয়ের ব্যাপারে এমন উদ্যোগী হয়ে উঠেছে? এর আগে হাজার বার নিজেকে এই প্রশ্নটা করেছে ধনপত। এখনও করল। আগেও কোন জবাব পায় নি সে। এখনও পেল না।

আরও একটা কথা বুঝে উঠতে পারছে না ধনপত। জগনের মা তিলিয়াকে দেখে যাবার পর তাকে কী বলবে সখিলাল? কী? কী?

সতের

এবার প্রায় দেড় মাসের মত হ'ল, ছকুরাম এখানে এসেছে। প্রথম প্রথম তিলিয়া যখন চানের জল তুলে রাখত, রান্নার আয়োজন করে দিত, তার ভাল লাগত না। জীবনে কোনদিন সে কারো সেবা পায় নি এবং যেচে কেউ সেবা করতে এলেও নেয় নি। তার অনভ্যস্ত মন তিলিয়ার এই সেবায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। ভাবত, এ সবের পেছনে কোন গূঢ় মতলব আছে।

কিন্তু ইদানীং ছকুরামের সংশয় কেটে যেতে শুরু করেছে। অনেক যাচাই করে সে বুঝেছে, তিলিয়ার এই সেবার পিছনে কোন দুরভিসন্ধি নেই। তার মমতা খাঁটি সোনার মত, তাতে কোন খাদ বা ছলনা নেই।

তাই বুঝি আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ছকুরাম। চলতে-ফিরতে-উঠতে-বসতে—সব সময় তিলিয়ার মুখটা মনে পড়ে যায়। তিলিয়ার কথা যতই ভাবে ততই বিস্মিত হয়, ততই মগ্ন হয়।

একেক দিন আভনপুর এসে ছকুরাম ফির্তুকে বলে, 'লেড়াকটা বহুত আজীব রে ফির্তু, বহুত আজীব—'

সঙ্গী বল সহচর বল আর সুহৃদই বল, ফির্তুই তার সব। পৃথিবী নামে কোটি কোটি মানুষের এই গ্রহটিতে একমাত্র ফির্তুর সঙ্গে তার যা কিছু বন্ধুত্ব, যা কিছু ঘনিষ্ঠতা। প্রাণের কথা বলার মত এই একজন মনোযোগী শ্রোতাই তার আছে। মাঝে মাঝে নিজেকে তার কাছে উন্মুক্ত করে দেয় সে।

ছকুরাম বলতে থাকে, 'লেড়কিটা আমার চানের জন্যে পানিয়া তুলে দ্যায়।'

'হাঁ—' ফির্তু মাথা নাড়ে।

'আমার রোটি বানিয়ে দ্যায়।'

হাঁ—'

'আমার বিস্তারা পেতে দ্যায়।'

'হাঁ—'

'আমি যখন খাই, লেড়কিটা কাছে বসে কত কথা বলে।'

'হাঁ—'

'তমাসার কথা, মজার কথা, হরেক কিসিমের কথা। সমঝালি?'

'হাঁ—'

'লেড়কি বহুত খুবসুরতি—'

'হাঁ—'

তিলিয়া সম্বন্ধে অনর্গল বলে যায় ছকুরাম। আর মাথা নেড়ে সামনে সায় দিতে থাকে ফির্তু।

'সারা জিন্দগীতে এমন করে কেউ আমার সেবা করে নি।' ছকুরাম বলে।

'কেউ না?' এই প্রথম প্রশ্ন করল ফির্তু।

'না।' প্রায় অবরুদ্ধ গলায় জবাব দেয় ছকুরাম।

আর কিছু জিগ্যেস করল না ফির্তু।

ছকুরাম বলতে লাগল, 'সারা জীওন কত মানুষ দেখেছি। লেকেন

অ্যায়সা লেডকি আর একটাও চোখে পড়ে নি।'

'হাঁ—' যথারীতি আবার মাথা নাড়তে শুরু করে ফিতু´।

'লেড়কিটার সাথ কত খারাপ ব্যবহার করেছি। তবু সে মুখ কালো করে নি।'

'হাঁ—'

'কিসে আমার আরাম হবে, কিসে আমার সুবিস্তা হবে—সবসময় তাই করে যাচ্ছে।'

রোজই আভনপুর এসে তিলিয়ার কথা বলে ছকুরাম। শুনতে শুনতে কী বোঝে, ফিতু´ই জানে। তার ইন্দ্রিয়গুলো অস্পষ্টভাবে কিছু একটা যেন টের পায়। একদিন সে বলে বসে, 'লেডকিটার কথা তুই বড় বেশি বলছিস ছকুয়াজি—'

'অঁ—' হঠাৎ থতমত খেয়ে যায় ছকুরাম।

প্রায় দশ বছর এখানে আসছে ছকুরাম। এতকাল সুদ আর খাতক ছাড়া আলোচনার কোন বিষয় তার ছিল না। ইদানীং কয়েকদিন তিলিয়া ছাড়া প্রায় কোন কথাই বলছে না সে। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পরিবর্তনটা এত স্পষ্ট যে ফিতু´র মত অবোধ পশুটার চোখেও তা ধরা পড়েছে।

ছকুরাম যেন সচেতন হয়ে উঠল, 'লেড়কিটার কথা বড় বেশি বলে ফেলেছি, না রে ফিতু´?'

'হাঁ—' ফিতু´ ঘাড় কাত করল। বলল, 'লেড়কিটার কথা বলতে গেলে কোনদিকে তোর হুঁশ থাকে না।'

ছকুরাম শুধলে, 'কি-রকম?'

ফিতু´ বলল, 'এই দ্যাখ না, এ ক'দিন করজদারদের কাছে সুদ আদায় করতে বেরুস নি। নতুন করে কারুকে টাকা গছাতে যাস নি। স্রিফ বসে বসে লেড়কিটার কথা বলেছিস।'

ছকুরাম আর কিছু বলল না। একদৃষ্টে ফিতু´র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হ'ল, ফিতু´ নামে অনুগত অবোধ এই মারিয়াটা শুধুমাত্র সুদ আদায়ের যন্ত্রই না, তার মনের ঘরে জাগ্রত

প্রহরীও। সুদ খাতক আর কর্জ নিয়ে ছকুরামের যে পৃথিবী, তার বাইরে অন্য কোনদিকে সে তাকে পা বাড়াতে দেবে না। পা বাড়ালেই হুঁশিয়ার করে দেবে।

* * *

ক'টা দিন অন্যমনস্ক হয়ে ছিল ছকুরাম। শুধু অন্যমনস্কই না, আত্মবিস্মৃতও। সে ভুলে গিয়েছিল, আর পনের-বিশ দিন পরেই আভনপুরের মরসুম শেষ হয়ে যাবে। এর মধ্যেই সমস্ত পাওনা আদায় করে নিতে হবে, নইলে এবার আর প্রাপ্তির আশা নেই। তিলিয়া নামে সোনাহুরুদের মেয়েটা এই ক'টা দিন তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই আচ্ছন্নতা, অন্যমনস্কতা এবং আত্মবিস্মৃতি—এ সবাই তার স্বভাবের বিপরীত। সাময়িক একটা ঘোর কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল ছকুরাম।

আজ আভনপুর এসে আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

পুরনো খাতকদের মধ্যে প্রায় সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে ছকুরামের। তার প্রাপ্য টাকা অনেকেই শোধ করে দিয়েছে। যারা দেয় নি, তারা কথা দিয়েছে মরসুম শেষ হবার আগেই দিয়ে দেবে।

সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজন হ'ল রাজুয়া।

বছর দুই আগে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে সেই যে সে গেল, আর তার দেখা মেলে নি। দু-বছর সে আভনপুর আসছে না। এ দিকে সুদে আসলে তার কাছে পাওনা হয়েছে প্রায় সত্তর টাকার মত।

এখন দুপুর।

নিজের চালাটিতে বসে রাজুয়ার কথা যত ভাবছে, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে ছকুরাম। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, ফিতু—'

ফিতু ছায়ার মতই পাশে বসে ছিল। ডাকটা কানে পৌঁছেনো মাত্র ভোঁতা গলায় সাড়া দিল, 'হাঁ—'

'চল্ একবার দেবানীর কাছে যাই।'

'চল্—'

দু-জনে উঠে পড়ল।

দেবানী ছকুরামের খাতক। বস্তার জেলার কোণ্ডাগাঁওএ তার বাড়ি। রাজুয়াও ঐ গ্রামেরই লোক। দেবানীর সুপারিশে তাকে ধার দিয়েছিল ছকুরাম।

বঙিয়া নদীর পার ঘেঁসে সারি সারি মারোয়াড়িদের গদীগুলো পেরুলেই প্রকাণ্ড একটা ঢিবি। ঢিবির মাথায় কিছু আনার, কিছু আমলকি আর সামান্য কিছু বজরা নিয়ে দোকানদারি করতে বসেছে দেবানী।

ছকুরাম আর ফিতু তার সামনে এসে হাজির হ'ল।

দেবানীর চেহারায় এমন কিছুই বিশেষত্ব নেই। আর দশ জন আদিবাসী মারিয়া যেমন, দেবানীরও তেমনি তামাটে শরীর, নাক তেমনি চ্যাপটা। ভাবলেশহীন ছোট ছোট চোখ।

ছকুরামদের দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল দেবানী। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আবার কি! বিশ রোজ আগে তো তুমহার সুদের রুপেয়া শোধ করে দিয়েছি—'

'না না, সুদের জন্যে আসি নি।' ছকুরাম বলল।

'তব্ ?'

'এসেছি রাজুয়ায় খবর নিতে। তুমহার কথামত উ শালাকে পঁচাশঠো রুপেয়া করজ দিলাম।' ছকুরাম বলতে লাগল, দো সাল হয়ে গেল। হারামীটা সুদ তো দিচ্ছেই না, আসলের রুপেয়াটাও মার যেতে বসেছে।'

দেবানী চুপ।

ছকুরাম আবার বলল, 'পিছু সালও হারামীটা ইধর আসে নি, এহি সালও আসছে না।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল দেবানী।

'শালেকে ব'ল তো আমার সাথ যেন একবার দেখা করে।'

'রাজুয়া তো তুমহার সাথ এখন দেখা করতে পারবে না।' এতক্ষণে মুখ খুলল দেবানী।

'কেন?'

'ওর লেড়কির শাদি কি-না। তাই বহুত ঝামেলায় আছে' দেবানী বলল, 'আর সেই জন্যেই এ সাল ইধার আসতে পারছে না।'

ছকুরামের মুখের ওপর দিয়ে অনেকগুলো রেখা খেলা করে গেল। চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'রাজুয়ার লেড়কির তা হলে শাদি!'

'হাঁ—'

'কবে?'

'আট দশ রোজ বাদ।'

'ঠিক আছে। রাজুয়াকে কিছু বলতে হবে না। দো-চার রোজের মধ্যে আমিই ওর সাথ দেখা করব।'

আঠার

উঠানের এককোণে আঁওলা গাছটা। তার তলায় চুপচাপ বসে রয়েছে তিলিয়া।

এখন বিকেল।

সূর্যটা শালবনের দিকে ঢলে পড়েছে। আকাশটা টকটকে লাল। এত লাল, মনে হয় রক্তাক্ত।

মাবিয়ারা যেমন করে তীর দিয়ে হরিণ বেঁধে তেমনি করেই কোন অদৃশ্য তীরন্দাজ যেন আকাশটাকে বিদ্ধ করেছে।

বিকেলের শরবিদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল তিলিয়া।

হঠাৎ চাপা গলার ফিসফিসানি কানে এল। চমকে উঠল তিলিয়া। ঘরে বসতেই তার চোখে পড়ল ধনপত বুড়ো একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসল।

লোকটার মাথাভর্তি তামাটে রঙের জটবাঁধা চুল। গোঁফ-দাড়ি আর অজস্র রেখায় মুখখানা জটিল। গায়ের চামড়া কোঁচকানো। চোখের দৃষ্টি ভীত, চকিত এবং অসহায়।

একফালি চিটচিটে ন্যাকড়া নেংটির মত করে পরে আছে লোকটা। তার সমস্ত অবয়বে অভাব, হতাশা আর ভীরুতা সুস্পষ্ট।

আকর্ষণ করার মত কিছুই নেই লোকটার। না চেহারার জলুস, না পোশাক-আশাকের চাকচিক্য। একনজর তাকে দেখেই আবার আকাশের দিকে চোখ ফেরাল তিলিয়া।

আকাশটা আরো লাল হয়েছে। ক'টা সোনালী বাজ উড়ে উড়ে সেদিকে চলেছে। খুব সম্ভব, দিনান্তের রংবাহারি আকাশ তাদের জাদু করেছে।

ধনপতের সঙ্গে যে লোকটা এসেছে, সে বলে উঠল, 'আমাকে তুমি বাঁচাও ধনপতজি—'

'আমি তুমহাকে বাঁচাব!' যেন অবাকই হ'ল ধনপত। বলল, 'কী বলছ রাজুয়া!'

বোঝা গেল, আগন্তুকের নাম রাজুয়া।

রাজুয়া বলল 'ঠিকই বলছি। তুমি ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'কী হয়েছে তুমহার?' ধনপত শুধলো।

'দো সাল পিছে ছকুয়াজির কাছ থেকে পঁচাশঠো রুপেয়া করজ নিয়েছিলাম।'

রাজুয়ার মুখে ছকুরামের নাম শুনে উৎকর্ণ হল তিলিয়া। চোখদুটো তার আকাশের দিকে ফেরানো। কিন্তু কান রইল ঘরের দাওয়ায়।

ধনপত বলল, 'করজ নিয়েছিলে তাতে হয়েছে কী?'

'বড় মুশকিল হয়েছে।'

'কি-রকম?'

দো-সাল হ'ল ছকুয়াজির সুদটা দিতে পারছি না। পিছু সাল ভারি বুখার (অসুখ) হয়েছিল। তাই ক্ষেতি করতে পারি নি। আর এই সাল আমার লেড়কির শাদি।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল ধনপত, 'হুঁ—'

'পরশুরোজ আমার লেড়কিটার শাদি হবে। শুনলাম, ওহি রোজ রুপেয়া আদায় করতে আমার গাঁওএ যাবে ছকুয়াজি।'

'হুঁ—'

'বড় বিপদ ধনপতজি—'

'হুঁ—'

শাদির রোজ গিয়ে ছকুয়াজি যে কী করবে, ভগোয়ান জানে। আমার বহুত ডর লাগছে।'

'হুঁ—'

'রুপেয়ার জন্যে ও আদমিটা সব পারে।'

'তা পারে।'

একটু চুপচাপ।

রাজুয়া আবার শুরু করল, 'ছকুয়াজিকে তুমি একটু বোঝাও চাচা। এ সাল ও যেন না যায়। আগেলা সাল আমি ওর তামাম রুপেয়া মিটিয়ে দেব।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ধনপত। বলল, 'ছকুয়াকে বলে কুছু লাভ নেই। আমার কথা ও শুনবে না।'

'শুনবে শুনবে, তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই শুনবে।' ধনপতের দু-হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল রাজুয়া।

'আরে না-না, দশ সাল আমি ওকে দেখছি। কারো কথাই ও শোনে না।'

'তা হ'লে তুমি আমার হয়ে বলবে না?' রাজুয়ার গলাটা ব্যথিত শোনাল।

'বললাম তো, বলে কোন লাভ নেই।' ভারি নিরুপায় মনে হ'ল ধনপতকে।

'বড় আশা নিয়ে তুমহার কাছে এসেছিলাম চাচা। ভেবেছিলাম, তুমি ভরোসা দেবে।'

'কী করব, বল। ছকুয়াকে জানি বলেই তুমহাকে ভরোসা দিতে পারলাম না।'

'তা হ'লে আর কি! এবার যাই।' রাজুয়ার মুখটা করুণ, বিষন্ন এবং হতাশ দেখাল।

আঁওলা গাছটার তলায় বসে এতক্ষণ রাজুয়া আর ধনপতের কথা শুনছিল তিলিয়া। হঠাৎ কি যেন হ'ল তার, ক্ষিপ্র বেগে উঠে পড়ল। যেমনভাবে উঠল ঠিক তেমনিভাবেই দাওয়াটার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সোজা রাজুয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও রাজুয়াজি, তুমহার কোন ডর নেই। পরশুরোজ ছকুয়াজি তুমহার ওখানে যাবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব।'

রাজুয়ার পাশেই বসে রয়েছে ধনপত। সে প্রায় আঁতকে উঠল, 'কি বলছিস তিলিয়া। ছকুরামকে তুই চিনিস না, ওর কোন কথায় থাকিস না। ভারি ঝামেলা হবে।'

তিলিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। খুব শান্ত গলায় সে বলল, 'ঝামেলা যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

উনিশ

রাত্রিবেলা ছকুরামকে খেতে দিয়ে পাশে এসে বসল তিলিয়া। সমস্ত দিনের মধ্যে এই একটা মাত্র সময় যখন সে ছকুরামকে কাছে পায়।

ঘরের মাঝখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেটা থেকে যতখানি আলো পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে ধোঁয়া।

খানিকক্ষণ এ কথা সে কথা হ'ল। তারপর হঠাৎ তিলিয়া বলল, 'আজ বিকেলে রাজুয়াজি এসেছিল।'

'রাজুয়া! কোন রাজুয়া?' ভুরু কুঁচকে ছকুরাম তাকাল।

'তুমহার কর্জদার (খাতক), ওই কোণ্ডাগাঁও এর লোকটা—'

ছকুরামের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'এখানে এসেছিল যে! মতলব কী শালেটার?'

'পরশু রোজ রাজুয়াজির লেড়কির শাদি।' বলেই তীক্ষ্ণ চোখে ছকুরামের মুখের দিকে তাকাল তিলিয়া।

'জানি।' রুটি আর ভাজি নাড়াচাড়া করতে করতে ছকুরাম জবাব দিল।

'তুমি জান!'

'হাঁ। ওহী রোজ ফিতুকে সাথ নিয়ে আমি কোণ্ডগাঁও যাচ্ছি।'

'কোণ্ডগাঁও যাবে? কেন?'

'কেন আবার। রাজুয়ার লেড়কির শাদিতে আমাদের দু-জনের নেমন্তন্ন যে।' শব্দ করে হেসে উঠল ছকুরাম।

প্রায় দু-মাস হতে চলল ছকুরাম এখানে এসেছে। এর আগে আর কোনদিনই তাকে হাসতে দেখে নি তিলিয়া। যদিও বা এই প্রথম দেখল, তিলিয়ার মনে হ'ল, হাসিটা যেমন সাঙ্ঘাতিক তেমনি ভয়ানক। সে বলল, 'নেমন্তন্ন তো নয়, তোমরা যাচ্ছ গরীব দুঃখী লোকটাকে বিপদে ফেলতে।

'কেমন?' যেন কিছুই জানে না, এমন একটা ভাব করল ছকুরাম।

'কেমন আবার। তোমরা তো যাচ্ছ রুপেয়া আদায় করতে।'

'অ, রাজুয়া শালে দেখছি সব কথাই তুমহাদের বলে গেছে।'

'হাঁ—'

'তা হ'লে তো ভালই হয়েছে। শোন ধনপতজির ধরমবেটি, দো সাল অই হারামীটার কাছ থেকে একটা পয়সা পাইনি। দেখি লেড়কির শাদির দিন গিয়ে কুছু আদায় করতে পারি কি-না?'

'না-না, শাদির দিন তুমি যেও না ছকুয়াজি।'

ছকুরাম উত্তর দিল না।

তিলিয়া বলতে লাগল, 'এ সালটা তুমি রেহা করে দাও। আগেলা সাল রাজুয়াজি তুমহার সব রুপেয়া শোধ করে দেবে বলেছে।'

ছকুরাম বলল, 'কোন বাহানাই শুনব না আওরত। এ সালই আমার রুপেয়া চাই। পরশু রোজ ফিতুর্কে নিয়ে আমি কোগুর্গাও যাবই।'

'তুমি ভারি বেদর্দ (যার দরদ নেই).'

'ঠিক ধরেছ। আমার ভিতরটা একেবারে শুখা। পাথরকা মাফিক।'

'কেন, এমন কেন?' অবুঝ আর বিষণ্ণ চোখে ছকুরামের দিকে তাকাল তিলিয়া।

ছকুরামও একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'কেন, শুনতে চাও?'

এতদিন যেচে যেচে কত প্রশ্ন করেছে তিলিয়া। কিন্তু ছকুরাম নিজের সম্বন্ধে চিরদিনই মুখ বুঁজে থেকেছে। একবারই শুধু সে বলেছিল তার বাপ মৈথিলি ব্রাহ্মণ। মায়ের কথা সে বলে নি। মায়ের কথা শুরু করেই চুপ করে গিয়েছিল। একমাত্র বাপ ছাড়া তার জীবনের অন্য কোন কথা জানা যায় নি। ছকুরামের চারপাশে অনেকগুলো যবনিকা ফেলা আছে। সেগুলো তুলে ধরতে তার নিদারুণ অনিচ্ছা।

তিলিয়া ভেবেছিল, আজও তার প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর থেকে যাবে ছকুরাম। কিন্তু পরম অপ্রত্যাশিতভাবে ছকুরাম নিজের সম্বন্ধে বলতে চাইছে। প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারে নি তিলিয়া। যতখানি বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি চমকে উঠেছে। চমক আর বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলে উঠল, 'শুনতে চাই, এক শ বার শুনতে চাই।' আগ্রহে আর ব্যগ্রতায় তার চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

'তবে শোন।' বলেই চোখ বুঁজল ছকুরাম। ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে লাগল। ভাবনা চোখে দেখা যায় না। মানুষের মনের অতল অন্ধকারে কিসের লীলা চলে, ওপর থেকে বুঝবার জো নেই।

মনের ভেতরটা দেখা না যাক, মুখটা তো দেখা যায়। ছকুরামের মুখের চামড়া অসংখ্য কুঞ্চনে কুঁকড়ে যাচ্ছে। নাকটা ফুলে ফুলে

উঠছে। নাক মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে কোথায় যেন নিদারুণ একটা তোলপাড় চলছে।

একসময় চোখ মেলল ছকুরাম। দৃষ্টিটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। চাপা, তীব্র গলায় সে শুরু করল, 'তিশ পঁয়তিশ বরস বয়স হ'ল আমার। এর মধ্যে কোন মানুষের পেয়ার আমি পাই নি।'

'কোন মানুষের না?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল তিলিয়া।

'না।' ছকুরাম বলতে লাগল, 'কেউ কোনদিন আমাকে ভালবাসে নি। বাপ-মা-বন্ধু-বান্ধব—সবাই আমাকে ঠকিয়েছে। দুনিয়ায় যে মানুষটার কাছেই গেছি, সে-ই ঘা দিয়েছে।'

'সবাই তুমহাকে ঠকিয়েছে? সবাই ঘা দিয়েছে?'

'হাঁ।'

'কেন?'

'জানি না, জানি না—' জোরে জোরে প্রায় উন্মত্তের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল ছকুরাম।

তিলিয়া আগেই অনুমান করেছিল, ছকুরাম নামে এই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা লুকিয়ে রয়েছে। আজ মনে হ'ল সেই যন্ত্রণাটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। তার তুলনা নেই।

ছকুরাম থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে সে, 'কোনদিন কারো কাছে অন্যায় করি নি। কাউকে এতটুকু দুখ দিই নি। তবু কেউ আমাকে ভালবাসে নি।' একটু থেমে আবার, 'শুধু একটামাত্র দোষ আছে আমার জীওনে। সেইজন্যেই সবাই আমাকে ঘেন্না করেছে, কাছে গেলে গায়ে থুক দিয়েছে। লেকেন সেই দোষটায় আমার তো কোন হাত ছিল না।'

'কী দোষ?' তিলিয়া উন্মুখ হ'ল।

কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ছকুরাম। খুব শান্ত গলায় বলল, 'সে কথা আজ থাক। আরেক দিন শুনো।'

'আজই বল না?'

'না।'

তিলিয়া বুঝল, জোর করে কোন ফল হবে না। শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ছকুরাম। অনুরোধ-উপরোধ, রাগ-অভিমান, কোন কিছু দিয়েই এখন আর তার মুখ খোলানো যাবে না। তবু খুশীই হ'ল তিলিয়া।

অন্য সবার কাছে অতি সাবধানে নিজের সমস্ত অতীতটাকে গোপন করে রাখে ছকুরাম। একমাত্র তিলিয়ার কাছেই মাঝে মাঝে তার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্য ঢাকনাটা একটু সরিয়ে দেয়।

পৃথিবীতে তিলিয়াই একমাত্র মানুষ যে ছকুরামের জীবনের নিষিদ্ধ অন্ধকার জগতের যত সামান্য অংশই হোক, দেখতে পেয়েছে। তার বাপ-মা-বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে কিছুটা আভাসও অন্তত পেয়েছে। আপাতত তাতেই সে সন্তুষ্ট। তার স্থির বিশ্বাস, একদিন না একদিন নিজের হাতেই চারপাশের সমস্ত যবনিকা তুলে ধরবে ছকুরাম। সেদিনের জন্য সে অপেক্ষা করবে।

হঠাৎ ছকুরাম বলে উঠল, 'কারো কিরপা কারো পেয়ার আমি পাই নি। বাপ-মা থেকে শুরু করে দুনিয়ার সব মানুষ আমাকে শুধু দুখই দিয়েছে। যেখানেই ভালবাসার জন্যে হাত বাড়িয়েছি সেখানেই ঠকেছি। ঠকে ঠকে আর দুখ পেয়ে পেয়ে আমার প্রাণটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। আমি এমন হয়ে গেছি।'

কথাগুলো যেন তিলিয়াকে বলছে না ছকুরাম। তিলিয়াকে উপলক্ষ্য করে নিজেকেই শোনাচ্ছে।

সে বলতে লাগল, 'অথচ একটু পেয়ার একটু ভালবাসা যদি কখনও পেতাম, তা হ'লে—'

'কী?' তিলিয়া শুধলো।

'তা হ'লে হয়ত আমি এমন নিষ্ঠুর হতাম না।' সজ্ঞানে নয়, ঘোরের মধ্য থেকে যেন ছকুরাম বলে উঠল।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় ঘোর কাটিয়ে ফেলল ছকুরাম। আবার আরম্ভ করল,

'সারা জীওন কেউ আমাকে ভালবাসে নি : আমিও কাউকে বাসি না। কেউ আমাকে পেয়ার করে নি ; আমিও করি না।'

'লেকেন—' অস্ফুট গলায় তিলিয়া বলল।

'কী?'

'আর সবার সাথ যা খুশি করো। শুধু রাজুয়াজিকে তুমি কিরপা কর। ওর লেড়কির শাদি। এ সালটা তুমি ওকে রেহা করে দাও।'

'কেন কিরপা করব? রাজুয়ার সাথ আমার কোন খাতির? কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল ছকুরাম।

তিলিয়া আর কিছু বলল না।

* * *

দিন দুই পরের কথা।

অন্য দিন সকাল হ'লেই টাঙা হাঁকিয়ে আভনপুর চলে যায় ছকুরাম। আজ কিন্তু গেল না। ঘুম থেকে উঠে বাইরের দাওয়ায় এসে চুপচাপ বসে রইল।

কুয়ো থেকে জল তুলছিল তিলিয়া। ছকুরামের দিকে তাকিয়ে সে শুধলো, 'আজ আভনপূর যাবে না?'

ছকুরাম বলল, 'না।'

'কেন, শরীর খারাপ?'

'না।'

তিলিয়া আর কোন প্রশ্ন করল না। জল তুলে তুলে গাগরায় ভরতে লাগল।

পৌষের বেলা একটু একটু করে বেড়ে চলছে।

জল তুলতে তুলতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল তিলিয়া। হঠাৎ চাপা গলার আওয়াজে তার হুঁশ ফিরল। দেখল, ছকুরামের পাশে ফিতু বসে রয়েছে।

ফিতু যে কখন এসেছে আর কখন নিঃশব্দে ছকুরামের পাশে গিয়ে বসেছে, তিলিয়া টের পায় নি। কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনতে লাগল সে।

ছকুরাম বলল, 'অনেক বেলা হয়েছে। চল্ ফিতু, বেরিয়ে পড়ি।'

ফির্তু বলল, 'চল্—'

'পয়দলই (পায়ে হেঁটেই) যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। ওদিকে টাঙা যাবার পথ নেই।'

দু-জনে উঠে পড়ল। তারা দাওয়া থেকে নামতে যাবে, ঠিক সেই সময় সামনে এসে দাঁড়াল তিলিয়া। শুধলো, 'কুথায় যাচ্ছ ছকুয়াজি?'

'কোণ্ডগাঁও।' ছকুরাম জবাব দিল।

'রাজুয়াজির কাছে?'

'হ্যাঁ।'

চকিতে সেই কথাটা মনে পড়ল তিলিয়ার। আজ রাজুয়ার মেয়ের বিয়ে। সে বলল, 'রাজুয়াজির লেড়কির শাদি না?'

'হ্যাঁ।'

ফির্তুকে নিয়ে আজ তুমি কোণ্ডগাঁও যেও না ছকুয়াজি।' করুণ গলায় তিলিয়া বলল।

'যাবই। দো সাল শালেটা রুপেয়া দিচ্ছে না। এই শাদির সময়—' বলতে বলতে চুপ করল ছকুরাম।'

'তুমি গেলেই একটা হাঙ্গামা হবে।'

'হবে তো হবে।'

'তুমহার রুপেয়া দিতে হ'লে রাজুয়াজি লেড়কির শাদি দিতে পারবে না।'

'না পারুক।'

'লেড়কির শাদি যদি একবার ভেঙে যায়, হয়ত সারা জীওন আর শাদি হবে না।' গলাটা কেমন যেন বুজে এল তার। খুব সম্ভব, রাজুয়ার মেয়ের প্রসঙ্গে নিজের কথাটাই মনে পড়েছে! তারও বিয়ে ভেঙে গেছে। ধনপত এত চেষ্টা করছে, তবু একটা সম্বন্ধ জোটাতে পারছে না। তিলিয়া জানে, পারবেও না। এ জীবনে বিয়ে তার হবে না।

যে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার যে কি গ্লানি আর কি যন্ত্রণা, তিলিয়া

জানে। আর জানে বলেই রাজুয়ার মেয়ের জন্যে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সে চায় না, মেয়েটার ভাগ্য তার মত হোক।

ছকুরাম বলল, 'রাজুয়ার লেড়কির শাদি যদি ভেঙে যায়, আমার তাতে কী? আমার পাওনাটা আদায় করতে পারলেই আমি খুশী।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ ফিসফিস করে ডেকে উঠল তিলিয়া, 'ছকুয়াজি—'

'বল—' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ছকুরাম।

'ফির বলছি, আজ তুমি কোণ্ডাগাঁও যেও না।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ছকুরাম। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, 'একটা কথা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'রাজুয়ার জন্যে তুমহার এত দরদ কেন?'

'রাজুয়াজির জন্যে না।'

'তবে?'

'তুমহার জন্যে।' গলাটা অদ্ভুত গাঢ় শোনাল তিলিয়ার।

'আমার জন্যে!' যেন বিস্মিতই হ'ল ছকুরাম।

'হাঁ।' কি একটু ভাবল তিলিয়া। তারপর বলল, 'শুধু দরদই না, তুমহার জন্যে বড় দুখও হয় ছকুয়াজি।'

'কেন?'

'সুদের কারবার করতে করতে আসল জিনিসটাই তুমি হারিয়ে ফেলেছ।'

'কী হারিয়েছি শুনি?'

'আমার মুখে শুনতে হবে না। ভেবে দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে।'

ছকুরাম জবাব দিল না।

তিলিয়া বলতে লাগল, 'মানুষকে একটু পেয়ার করতে শেখ ছকুয়াজি। দেখবে, যা হারিয়েছে তা তো ফিরে পেয়েছই। তার ওপরও

আরো কুছু পেয়েছ।'

এদিকে অনেকখানি বেলা হয়েছে। অস্থির হয়ে উঠল ছকুরাম। ফিতু´র দিকে তাকিয়ে বলল. 'চল্ ফিতু´—'

তিলিয়া বলল, 'তুমি তা হ'লে যাবেই ছকুয়াজি?'

'হাঁ।'

'আমার কথাটা তা হ'লে রাখবে না?'

'না।'

এবার ক্ষুব্ধ গলায় তিলিয়া বলল, 'তুমহার ওপর কোন জোর তো নেই। থাকলে তুমহাকে যেতে দিতাম না।' একটু থেমে আবার, 'যাক যাও, তবে আমার একটা কথা মনে রেখ। রাজুয়াজিকে কিরপা কর। তার সুদটা এবারের মত রেহা করে দিও। দেখ, তুমহার ক্ষতি হবে না।'

'বহুত তাজ্জবের কথা।'

'তাজ্জবের কথা কেন?'

'এদিকে বলছ রুপেয়া রেহা করতে। ওদিকে বলছ, ক্ষতি হবে না।' ছকুরাম বলতে লাগল, 'ক্ষতি হবে না কি তবে লাভ হবে?'

'লাভই হবে।'

'এতগুলো রুপেয়া রাজুয়া শালের কাছে আটকে থাকবে। আর তুমি বলছ কি-না লাভ হবে!'

'হাঁ।' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল তিলিয়া। বলল, 'জরুর লাভ হবে। তুমি যদি কিরপা কর, দেখবে রাজুয়াজিও তুমহাকে কুছু দেবে। সে যা দেবে, তুমহার ঐ রুপেয়া ক'টার চেয়ে তার কিমত —দাম অনেক বেশি।'

ছকুরাম রেগে উঠল, 'কী দেবে সে?'

'আমি যা বললাম তাই ক'র। তারপর দেখো, সে কী দ্যায়—'

রুষ্ট চোখে তিলিয়ার দিকে একবার তাকাল ছকুরাম। তারপর ফিতু´কে সঙ্গে নিয়ে কোণ্ডাগাঁও রওনা হ'ল।

দু-পাশে সীমাহীন প্রান্তর। প্রান্তরগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, লক্ষ বছরের বৃদ্ধ পৃথিবীটা এই মধ্যপ্রদেশে নিরেট, কর্কশ আর রক্তাভ হয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে ধুলোভরা পথ।

এখন দুপুর। মাথার ওপর আকাশটা ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দু-জনে চলেছে। দু-জনে অর্থাৎ ছকুরাম আর ফির্তু। আগে আগে যাচ্ছে ছকুরাম। পেছনে ফির্তু।

চলতে চলতে তিলিয়ার সেই কথাগুলো ভাবছে ছকুরাম। সুদের ব্যবসা করতে করতে কি একটা আসল জিনিস নাকি সে হারিয়েছে। কী খোয়া গেছে তার?

অনেক ভাবল ছকুরাম। কিন্তু কিছুতেই খোয়ানো জিনিসটার হদিস মিলল না।

একসময় পায়ের তলার পথটা ফুরিয়ে গেল। সামনেই শালবন। শালবনের ওপারে একটা বেঁটে পাহাড়ের মাথায় রাজুয়াদের ছোট গ্রাম, যার নাম কোণ্ডাগাঁও।

ছকুরামেরা যখন কোণ্ডাগাঁও-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছল তখন বিকেল।

দূর থেকেই শব্দটা অস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছিল। কাছে আসতেই বোঝা গেল, একসঙ্গে অনেকগুলো টিকারা বাজছে আর অসংখ্য মানুষ আনন্দে বিভোর হয়ে হল্লা করছে।

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল দুজনে। তারপর আবার চলতে শুরু করল।

খানিকটা এগুতেই খাড়া একটা চড়াই পড়ল। চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতেই রাজুয়াদের গ্রাম পাওয়া গেল। সোজা গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ল দু-জনে।

এর আগেও বারকয়েক কোণ্ডাগাঁও এসেছে ছকুরাম। এখানকার সব কিছুই তার জানা।

গ্রামটার একদিকে থাকে আদিবাসী মারিয়ারা, আরেকদিকে ভূমিজীবী কৃষাণেরা। কৃষাণদের এলাকাতেই রাজুয়ার ঘর। ছকুরামেরা

সেদিকেই চলল।

রাজুয়ার বাড়ির সামনেটা সমতল। সেখানে আসতেই বিচিত্র এক দৃশ্য চোখে পড়ল।

তিরিশ-চল্লিশজন মারিয়া মেয়ে কোমর ধরে সাপের মত হেলে দুলে নাচছে। মধ্যপ্রদেশের মাটির মতই তাদের গায়ের রঙ তামাটে, স্বাস্থ্য উদ্দাম আর যৌবন অফুরন্ত। সারা গায়ে তাদের শাল ফুলের গয়না। পরনে খাটো রঙিন শাড়ি। শাড়িগুলো এত ছোট যাতে আদিবাসী মেয়েগুলোর বন্য শরীর পুরোপুরি ঢাকা পড়ে নি। দেহের কতখানি ঢেকেছে আর কতখানি ঢাকে নি, সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন।

কোণ্ডাগাঁও-এর তাবৎ নারীপুরুষ—কেউ আর ঘরে নেই। সবাই নাচের আসরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

পুরুষগুলো উন্মত্তের মত টিকারা বাজাচ্ছে। আর মেয়েরা খুব সুরেলা গলায় কি একটা গান যেন গাইছে। নাচ আর গানের ফাঁকে ফাঁকে চিৎকার উঠছে, 'হোয়—হোয়—হোয়—হোয়—'

আনন্দ প্রকাশের এ এক আদিম রীতি।

নাচে-গানে-হল্লায় সমস্ত গ্রাম মেতে উঠেছে। কেন যে এই মতামাতি, বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ রাজুয়ার মেয়ের বিয়ে। আর সেই বিয়েটাকে উপলক্ষ্য করে কোণ্ডাগাঁও-এর কৃষাণ, আদিবাসী, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ উৎসব শুরু করে দিয়েছে।

নাচের আসরেই রাজুয়াকে পাওয়া গেল। ছকুরামকে দেখে সে আঁতকে উঠল, 'ছকুয়াজি, তুম !'

'হাঁ আমিই। চিনতে কষ্ট হচ্ছে ?' ক্রূর গলায় ছকুরাম শুধলো।

কি একটা যেন বলতে চাইল রাজুয়া। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। মুখচোখের ভাব দেখে মনে হ'ল, রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সে।

ছকুরাম থামে নি, 'দো সাল তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কী মতলব তুমহারি ?'

'কুছু খারাপ মতলব নেই ছকুয়াজি। পিছু সাল ভীষণ বুখার (ব্যারাম) হয়েছিল ; ক্ষেতি করতে পারি নি। তাই তুমহার রুপেয়াটা দিতে পারি নি।' ভীত গলায় রাজুয়া বলল।

পিছু সাল বুখার হয়েছিল আর এ সাল লেড়কির শাদি ঠিক করেছ তাই না ?'

'হাঁ।'

'এক-এক সাল তুমহার এক-এক বাহানা থাকলে আমার চলে কেমন করে ?'

'স্রিফ এই সালটা মাফ করে দাও ছকুয়াজি। আগেলা সাল তুমহার সব পাওনা শোধ করে দেব।'

'আগেলা সালের এখনও অনেক দেরি। অত দিন আমি সবুর করতে পারব না। আজই আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।'

রাজুয়া কেঁদে ফেলল, ছকুয়াজি, বহুত তকলিফ করে পচাশঠো রুপেয়া জোগাড় করেছি। রুপেয়াটা আমার বিটিয়ার শ্বশুরকে আজ শাদির সময় দিতে হবে।'

বিয়ের আসরে মেয়ের বাপ ছেলের বাপের হাতে পণের টাকা দেয়। মেয়ের বাপ যত গরীবই হোক, কিছু না কিছু টাকা ছেলেকে তার দিতেই হয়। এ দেশের এই প্রথা। প্রথাটা ছকুরাম জানে।

প্রথা অনুযায়ী রাজুয়াও কিছু পণ তার মেয়ের শ্বশুরকে দেবে। পণটা দেবে সেই বিয়ের সময় অর্থাৎ রাত্তিরে। তার অনেক আগেই ফিতুকে নিয়ে এসে পড়েছে ছকুরাম। টাকা আদায়ের এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে সে রাজী নয়।

রাজুয়া আবার বলল, 'আজ তুমহাকে রুপেয়া দিতে হ'লে বিটিয়ার শ্বশুরকে পণ দিতে পারব না। শাদিটা ভেঙে যাবে।'

ছকুরাম বলল, 'তুমহার কোন কথাই শুনতে চাই না। পাওনা নিতে এসেছি। দিয়ে দাও, চলে যাই।'

এদিকে নাচ, গান আর টিকারার বাজনা থেমে গেছে। মৃত্যুর মত অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এসেছে আসরটার ওপর।

ছকুরাম নামে এই সুদের কারবারীটাকে কোণ্ডাগাঁও-এর প্রায় সব মানুষই দেখেছে। যারা দেখে নি তারা তার নিষ্ঠুরতার কিংবদন্তী শুনেছে। একটা কিছু যে আসন্ন বুঝতে পেরে লোকগুলো রুদ্ধশ্বাসে

দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল রাজুয়া। আসরের ভেতর থেকে পনের ষোল বছরের একটা মেয়েকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। পরনে তার হলুদে ছোপানো নতুন শাড়ি। কপালে মেটে সিঁদুরের টিপ। সারা শরীরে শাল আর পলাশ ফুলের গয়না। মেয়েটার সর্বাঙ্গে পুরোপুরি বিয়ের সাজ।

গায়ের রঙ বেশ ফর্সাই। বয়সের তুলনায় মুখখানা ভারি কচি। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল, তার চোখ। সে চোখে কোন ভাবের খেলাই খেলছে না। মনে হয়, মরা মানুষের স্থির নিশ্চল চোখ।

মেয়েটাকে ছকুরামের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে রাজুয়া বলল, 'এই আমার বিটিয়া মঙ্গরা। পাওনা যদি নিতেই হয়, তার আগে গলা টিপে ওকে খতম কর।'

ছকুরাম চমকে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'কি বলছ রাজুয়া! মাথাটা কি তুমহার খারাপ হয়ে গেল!'

মাথা আমার ঠিকই আছে ছকুয়াজি।' রাজুয়া বলতে লাগল, শাদি ভেঙে গেলে লেড়কিটার কী হাল হবে, ভেবে দেখছ? সারা জীওন ওকে নিয়ে আমি কী করব?'

বিব্রত ছকুরাম একবার রাজুয়া আর একবার মঙ্গরার দিকে তাকাতে লাগল। তারপর সামনের আসরের দিকে চোখদুটো সরিয়ে নিয়ে গেল।

কখন নাচ-গান থেমে গিয়েছিল, ছকুরাম টের পায়নি। কোণ্ডাগাঁও-এর তাবৎ নারীপুরুষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের চোখে যুগপৎ ঘৃণা আর আতঙ্ক।

কেউ কথা বলছে না। চারপাশ আশ্চর্য স্তব্ধ। সেই স্তব্ধতার পটে হঠাৎ তিলিয়ার মুখটা মনে পড়ল ছকুরামের। খুব মিনতি করে সে বলেছিল, 'রাজুয়াজিকে এ সালটা রেহা করে দিও। দেখবে, তুমহার ক্ষতি হবে না।'

চারপাশের স্তব্ধতা, তিলিয়ার কথাগুলো, রাজুয়া, মঙ্গরা আর কোণ্ডাগাঁও-এর মানুষগুলো—সব মিলিয়ে ছকুরামের চেতনার ভেতর

কোথাও যেন একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। নিজের অজান্তে কখন যেন সে বলে ফেলল, 'রুপেয়াটা আগেলা সালই দিও রাজুয়া। এবারের মত তুমহাকে রেহা করে দিলাম।'

ছুটে ছকুরামের কাছে চলে এল রাজুয়া। তার হাতদুটো চেপে ধরে কিছু একটা বলতে চাইল। পারল না। অবরুদ্ধ গোঙানির মত একটা শব্দ বেরুল তার গলার ভেতর থেকে। হাসি আর কান্নায় মিশে তার মুখটাকে অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

একটু পর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে রাজুয়া মঙ্গরাকে বলল, 'পরণাম কর ছকুয়াজিকে।'

মঙ্গরা পায়ের কাছেই বসেছিল। প্রণাম করে উঠতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। অবাক হয়ে গেল ছকুরাম। অবাক হবারই কথা। কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার চোখদুটো ছিল মরা মানুষের চোখের মত স্থির আর ভাবলেশহীন! কৃতজ্ঞতায় সে চোখ এখন ঝাপসা।

মঙ্গরার দিক থেকে চোখ সারিয়ে আসরটার দিকে তাকাল ছকুরাম। আশ্চর্য! কোণ্ডাগাঁও-এর মানুষগুলোর চোখ থেকে ভয় আর ঘৃণা মুছে গেছে। তার বদলে অদ্ভুত এক খুশি চিকচিক করছে।

ছকুরাম বলল, 'নাচা গানা তুমরা বন্দ্ করলে কেন?'

পাশ থেকে রাজুয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'ছকুয়াজিকে মাঝখানে নিয়ে বসা। ফির নাচা-গানা চালু কর।'

ছকুরামকে আসরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

টিকাবাগুলোতে আবার কাঠি পড়ল। মারিয়া মেয়েদের সুঠাম দেহ নাচের আবেগে দুলে উঠল। কৃষাণী যুবতীদের গলা গুন গুন করতে লাগল।

যে আনন্দটা এতক্ষণ ভয় পেয়ে থমকে ছিল, হঠাৎ ঝড়ের মত তা উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

একসময় আখের গুড়ের শরবত আর দুটি কলা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রাজুয়া।

ছকুরাম বলল, 'আবার এসব কেন?

রাজুয়া বলল, 'আজ আমার বিটিয়ার শাদি। তুমি যদি কুছু না খাও বড় দুখ পাব।'

'দাও।'

যে ছকুরামকে কোনদিন কেউ কিছু খাওয়াতে পারে নি, সেই মানুষটা রাজুয়ার হাত থেকে শরবত আর কলা নিল। আজ ভারি উদার হয়ে গেছে সে।

নাচ-গান পুরোদমে চলেছে। খুব ভাল লাগছে ছকুরামের। মনে হচ্ছে এই উৎসব রাজুয়ার মেয়ে মঙ্গরার জন্যে নয়। সব কিছু তারই জন্যে।

একটু পর পরই ছুটে আসছে রাজুয়া। ছকুরামের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি-না, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে।

সুবিধা অসুবিধার খোঁজই শুধু নিচ্ছে না রাজুয়া, প্রাণের কথাও বলছে।

একবার এসে সে বলল, 'মঙ্গরার জন্যে যে লেড়কাটা ঠিক করেছি, তাদের ক্ষেতি আছে পন্দর বিঘা। দশটা ভঁইসা আর দোঠো গাই আছে, কেমন মনে হচ্ছে তুমহার?'

'ভালই তো।' ছকুরাম বলল।

'শাদিটা ঠিক করার আগে তুমহার সাথ যদি একটা পরামর্শ করে নিতাম, ভাল হ'ত।'

আরেকবার এসে রাজুয়া বলল, 'লেড়কাটাকে গাঁও-এর সবার খুব পসন্দ্ হয়েছে। সবাই বলছে, এমন লেড়কা হাজারে একটা মেলে না।'

ছকুরাম যেন তার ঘরের মানুষ! একেবারে আপনজন।

রাজুয়ার প্রতিটি কথায় প্রাণের উত্তাপ পাচ্ছে ছকুরাম। যে ছকুরাম পৃথিবীর সমস্ত বিষয়েই উদাসীন, কোন ব্যাপারেই যার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই উপযাচক হয়ে সে আজ প্রশ্ন করছে, 'নাম কী তুমহার জামাইর?'

'রঘু।'

'ঘর কাঁহা ?'

'বিলাসপুর জিলা। রাপত গাঁও।'

একসময় দিনটা ফুরিয়ে গেল।

ছকুরাম বলল, 'এখন আমি যাই রাজুয়া।'

'না-না, আজ তুমি যেতে পারবে না। বিটিয়ার শাদি দেখে জামাই দেখে কাল যাবে।' রাজুয়া বলল।

'আজ যাই, আরেক রোজ এসে তুমহার জামাই দেখে যাব।'

'থেকে গেলে বড় ভাল হত। রাজুয়া খুঁত খুঁত করতে লাগল।

'কথা দিলাম, আরেক রোজ আসব।'

'আসবে তো ?'

'হাঁ।'

'যাবেই যখন, চল এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'তুমহাকে আর যেতে হবে না। ফিতু আছে। ওকে সাথ নিয়েই চলে যেতে পারব।'

'না-না, এরকম ভাবে তুমহাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি না। সামনের শালবনটা খুব খারাপ। কখন যে শের বেরুবে, ঠিক নেই।' কোন কথাই শুনল না রাজুয়া। গ্রামের কয়েকটি জোয়ান ছেলেকে নিয়ে ছকুরামদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

গ্রাম পেরিয়ে শালবন। শালবনের পর প্রান্তর।

প্রান্তরের কাছে এসেই ছকুরাম বলল, 'তুমরা ফিরে যাও রাজুয়া। এবার আমরা যেতে পারব।'

রাজুয়া বলল, 'চল না আর একটু এগিয়ে দি।'

'না-না, আর আসতে হবে না। তোমরা ঘরে যাও। দেখ গিয়ে হয়ত বর এসে পড়েছে।'

অগত্যা রাজুয়ারা ফিরে গেল।

ছকুরাম আর ফিতু পাশাপাশি চলেছে।

চলতে চলতে হঠাৎ ফিতু ডাকল, 'ছকুয়াজি—'

কি যেন ভাবছিল ছকুরাম। অন্যমনস্কের মত সাড়া দিল, 'হাঁ—'

'রাজুয়াকে তুই এ সালের মত রেহা করে দিলি ?'

'দিলাম।'

'এ রকম সবাইকে যদি কিরপা করিস তা হ'লে ব্যাওসা তো বন্দ হয়ে যাবে।'

'যাবে তো যাবে।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না ফিতু। বিমূঢ়ের মত সে বলল, 'কী বলছিস ছকুয়াজি !

ছকুরাম আর জবাব দিল না। নিজের সেই ভাবনার মধ্যে আবার তলিয়ে গেল। সে ভাবছে এক বছরের জন্য রাজুয়াকে সে মাফ করে দিয়েছে। তার বদলে রাজুয়ার কাছ থেকে যা পেয়েছে তার তুলনা নেই।

এতকাল মানুষের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তা হল, ঘৃণা, ধিক্কার আর প্রতারণা। আজ যা পেল তা হ'ল, কৃতজ্ঞতা, প্রীতি এবং অকুণ্ঠ ভালবাসা।

ছকুরাম ভাবল, রাজুয়াকে সে যতটুকু দিয়েছে তার হাজার গুণ ফেরত পেয়েছে।

ঠিকই বলেছিল তিলিয়া। রাজুয়াকে রেহাই দিলে তার ক্ষতি হবে না। ক্ষতি তার হয় নি; বরঞ্চ অনেক বেশি লাভই হয়েছে।

* * *

এইমাত্র গোরীগাঁও-এ ধনপতের ডেরায় এসে পৌঁছল ছকুরাম।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। আজ কি তিথি, কে জানে। চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশা মিশে চারদিক রহস্যময় করে তুলেছে।

উঠান থেকে ছকুরাম দেখতে পেল, দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রয়েছে তিলিয়া। তার সামনে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছকুরাম। তার মনে হ'ল, তিলিয়া তারই জন্য অপেক্ষা করছে। মনে হতেই বিচিত্র সুখবহ এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এক সময় আস্তে আস্তে তিলিয়ার পাশে গিয়ে বসল ছকুরাম। ডাকল, 'তিলিয়া—'

তিলিয়া মুখ তুলল।

ছকুরাম বলল, 'তুমহার কথাটা রেখেছি তিলিয়া। রাজুয়াকে এ বারের মত মাফ্ করে দিয়েছি।'

'সচ্ বলছ!' গলাটা কেঁপে উঠল তিলিয়ার।

'সচ।' ছকুরাম বলতে লাগল, 'রাজুয়া লোকটা বড় ভাল। কত খাতির করল আমায়, কত পেয়ার করল। সারা জীবন অ্যায়সা খাতির আর অ্যায়সা পেয়ার কেউ আমায় করে নি।' গলাটা শেষ দিকে গাঢ় এবং গম্ভীর শোনাল তার।

তিলিয়া বলল, 'তুমহাকে তো আগেই বলেছিলাম, রাজুয়াজিকে রেহা করলে তুমি ঠকবে না।'

'ঠিকই বলেছিলে। আমি ঠকি নি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নিজের মনে কি যেন ভেবে ফিস ফিস করে উঠল ছকুরাম, 'সবই তুমহার জন্যে তিলিয়া, শ্রিফ তুমহার জন্যে—'

'আমার জন্যে কী?'

'সুদের কারবার করে করে আসল জিনিসটাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। তুমহার জন্যে আজ সেটা ফেরত পেয়েছি।'

'ফেরত পেয়েছ?' অস্থির অশান্ত গলায় তিলিয়া শুধলো।

'হাঁ—'

'কী পেয়েছ?'

'দিল (হৃদয়)।' দু-অক্ষরের সামান্য শব্দটা ছকুরামের বুকের গভীর থেকে যেন লাফ দিয়ে উঠে এল।

'দিল!' তিলিয়া চোখ বুঁজল।

'হাঁ। দিল-দিল-দিল-দিল—' ছকুরাম যেন জপ করতে লাগল।

মনেও পড়ে না কতকাল আগে হৃদয় নামে বিস্ময়ের রাজ্যটা সে হারিয়ে ফেলেছিল। আজ অনেক অনেক যুগ পর তিলিয়ার জন্য

আবার সেটা ফেরত পেয়েছে।

কৃতজ্ঞ ছকুরাম একদৃষ্টে তিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কুড়ি

পৌষ মাসটা প্রায় শেষ হয়ে এল। যত দিন যাচ্ছে, শীতের দাপট ততই বাড়ছে।

ক'দিন আগেও ভরদ্বাজ পাখিরা বাতাসে ঢেউ তুলে উড়ে উড়ে বেড়াত। ইদানীং তাদের দেখা যাচ্ছে না। বস্তার জেলার শালবন থেকে খরগোশ আর চিত্রল হরিণেরা দল বেঁধে গোরীগাঁও-এর দিকে চলে আসত। তারাও অদৃশ্য হয়েছে। যে যার উষ্ণ আশ্রয়ে এখন আত্মগোপন করেছে।

আজকাল আকাশটা প্রায় সারাদিনই ভারী কুয়াশায় আবৃত থাকে। কুয়াশা বিদ্ধ করে যে ছিটেফোঁটা রোদটুকু এসে পৌঁছয় তাও বিবর্ণ, নিরুত্তাপ।

এই শীতের ঋতুটা ধনপতকে খুবই কাবু করে রাখে। অন্য বছরের মত এবারও তার সমস্ত দেহের চামড়া ফেটে গেছে। কোমরে বাতের ব্যথাটা অসম্ভব রকম বেড়েছে।

আজকাল আর ঘুম থেকে উঠেই মোষ চরাতে বেরোয় না সে। প্রথমত বয়স হয়েছে। কাজেই শরীরটা অশক্ত এবং দুর্বল, তার উপর বাতের অসহ্য যন্ত্রণা। দ্বিতীয়ত সকাল বেলায় হাত-পা গুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে থাকে। মনে হয়, শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়তে ভয়ানক কষ্ট হয় তার।

কাজেই অনেক বেলায় সে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ মোটা কাঁথা জড়িয়ে উঠানের আঁওলা গাছটার তলায় বসে থাকে। তারপর কুয়াশা যখন একটু ফিকে হয়, অল্প অল্প নিস্তেজ রোদ দেখা দিতে থাকে তখন সে উঠে পড়ে। মোষদুটোকে ঘর থেকে বার করে

মাঠের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের এই সৃষ্টিছাড়া গ্রামখানা শীতে প্রায় কুঁকড়ে আছে।

অন্য দিনের মতই আঁওলা গাছটার তলায় বসে রয়েছে ধনপত। আকাশের দিকে খুব মগ্ন হয়ে তাকিয়ে কি ভাবছে।

হঠাৎ চাপা, বসা গলায় কে যেন ডেকে উঠল, 'এ ধনপত—'

চমকে মুখ নামাল ধনপত। দেখল, সখিলাল খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু নাক আর চোখ দুটো ছাড়া ভারী রোমশ কম্বলে তার সমস্ত দেহ ঢাকা।

'সখি ভেইয়া যে—' ধনপত বলল।

'হাঁ।'

'অ্যাত শীতে ঘর থেকে বেরিয়েছ!'

শীতে আমার কিছু হয় না।' বলতে বলতে মুখোমুখি উবু হয়ে বসল সখিলাল।

ধনপত বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। আমার চেয়ে বয়সে তুমি ঢের বড়। লেকেন এখনও জওয়ানই আছ। ঠাণ্ডা-গরম, কোন কিছুই তোমাকে কায়দা করতে পারে না।

'তা যা বলেছিস।' সর্দি-বসা ভারী গলায় শব্দ করে হেসে উঠল সখিলাল।

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ সখিলাল বলে উঠল, 'বুঝলি ধনপত—'

'বল—' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ধনপত।

'খবর পেয়েছিস তো?'

'কিসের?'

'মাঘ মাসের দশ তারিখে মামলার দিন পড়েছে।'

'জানি।'

'সে দিন আদালতে যাবি তো?' ধনপতের মুখের দিকে তাকাল সখিলাল।

'জরুর যাব। না গিয়ে এমনি-এমনি তোমাকে জমিটা ছেড়ে দেব নাকি!' ধনপত হাসতে লাগল।

দেখাদেখি সখিলালও হাসল। বোঝা গেল, মামলা সম্পর্কে দু-জনের কারোই বিশেষ চিন্তা নেই। পনের বছর আগে বিঘাদেড়েক জমি নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে শত্রুতা শুরু হয়েছিল আজ তার রঙ ফিকে হয়ে গেছে। উগ্রতা বা উত্তেজনা—কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। মামলাটা ইদানীং একটা পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সখিলাল বলল, 'এমনি-এমনি আমিই বা জমিটা নেব কেন? নিতে যদি হয় আদালতে লড়াই করেই নেব।'

'আমারও ঐ কথা। বুঝলে?' ধনপত বলল।

'বুঝলাম।' সখিলাল ঘাড় কাত করল।

এরপর ধানচালের দর, শীতের দাপট, দেশের হালচাল—এমনি নানা বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক কথা চলল।

অনেকক্ষণ হ'ল সখিলাল এসেছে। এখনও উঠবার নাম করছে না। উবু হয়ে মুখোমুখি বসেই আছে।

প্রথম প্রথম ধনপত ভেবেছিল, বুঝিবা মামলার খবর দিতেই সখিলাল এসেছে। তার মনে হচ্ছে, সখিলালের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আরো কিছু বলতে চায় সে।

ধনপত যা ভেবেছিল তাই হ'ল। একসময় সখিলাল বলে উঠল, 'তোর সাথ একটা কথা ছিল—'

ধনপতের স্নায়ুগুলো সজাগ ছিল। সে বলল, 'কা?'

'জগন পরসাদের সাথ আভনপুরের গঞ্জে কাল আমার দেখা হয়েছিল।'

'তাই নাকি?' রীতিমত উৎসুক হয়ে উঠল ধনপত।

'হাঁ।'

'কা বললে সে?'

'পরশু রোজ সে আর তার মা তোর ধরম বিটিয়া তিলিয়াকে দেখতে আসছে

‘পরশুরোজ ?’

‘হাঁ।’

‘কখন আসবে ?’

‘বিকালের দিকে।’

‘তা হ’লে তো ঐ-সময়টা আমাকে বাড়ি থাকতে হবে, কি বল—’

‘জরুর।’ সখিলাল মাথা নেড়ে সায় দিল।

‘আচ্ছা সখি ভেইয়া—’

‘বল্—’

‘সেদিন আমরা ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা কত-খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের তো কিছু আয়োজন করতে হবে।’

‘হাঁ হাঁ—’

‘কি-রকম আয়োজন করলে ভাল হয়, বল দিকি—’

‘রোটি-ভাজি-দহি-ক্ষীর আর লাড্ডু—এতেই বেশ হবে। খাওয়ার পর পান দিবি।’

‘আচ্ছা।’

‘এখন তা হ’লে যাই।’ উঠতে উঠতে সখিলাল বলল।

‘যাবে ?’

‘হাঁ।’

‘পরশুরোজ বিকেলে একবার এস কিন্তু। তুমি না এলে হবে না।’

‘সে তুই ভাবিস না। আমি ঠিক এসে পড়ব।’ বলতে বলতে সামনের রাস্তায় গিয়ে নামল সখিলাল। কি ভেবে আবার ফিরে এল। বলল, ‘আর একটা কথা ধনপত—’

‘কী ?’

‘কাল জগন পরসাদ বলছিল—’ এই পর্যন্ত বলেই সখিলাল থামল।

‘কী বলছিল ?’

‘শ-ও (এক শ) রুপেয়া ওকে পণ দিতে হবে।’

‘শ-ও রুপেয়া ?’

‘হাঁ।’

'লেকেন —'

'কী ?'

'অত রুপেয়া আমি কোথায় পাব ?' ধনপতের মুখে-চোখে এবং গলার স্বরে হতাশা ফুটল।

'সে যেমন করে হোক জোগাড় করতেই হবে।' অক্লেশে বলে ফেলল সখিলাল।

'লেকেন—'

'লেকেন-ফেকেন কুছ না ধনপত। জগনের মত লেড়কা শ-ও রুপেয়ার জন্যে যদি হাতছাড়া করিস, আপসোস করতে হবে।'

'সবই বুঝি সখি ভেইয়া। আমার অবস্থা তো তুমি জান। শ-ও রুপেয়া পণ, তার ওপর শাদির খরচ, খানা-দানার খরচ—এত সব কোথা থেকে জোগাড় করব ?'

'ওর জন্যে ভাবিস না। দেখবি, ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। সখিলাল অভয় দিল।

ধনপত চুপ করে রইল।

সখিলাল আবার বলল, 'আরো একটা কথা ছিল।'

'বল —' ধনপতের গলাটা অস্পষ্ট শোনাল।

একটু ইতস্তত করল সখিলাল। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা দেখে নিল। তারপর সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলতে লাগল, 'বুঝলি কি-না ধনপত, তিলিয়ার শাদির জন্যে এত খাটছি। পাঁচ রোজ তো ভরতপুরে জগন পরসাদের কোঠিতেই যেতে হ'ল। এত যে করছি কী জন্যে ? স্রিফ তোর মুখের দিকে চেয়ে।'

'ও তো ঠিক কথা।'

'তিলিয়ার শাদির পেছনে না খেটে যদি অন্য কাজ করতাম, তা হ'লে—'

সখিলাল ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে পারল না ধনপত। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শুধলো, 'তা হ'লে কী হ'ত ?'

মিটি মিটি হাসল সখিলাল। বলল, 'কী হ'ত, ভেবে ছাখ্ না—'

'কী ভাবব, বুঝতে পারছি না।' একটু বিরক্তই হ'ল ধনপত।

'সচ্ বলছিস, বুঝতে পারছিস না?'

'সচ্।'

'তবে শোন। এ-সময়টা অন্য কাজ-টাজ করলে কমসে কম তিশ-চল্লিশটা রুপেয়া কামাতে পারতাম কি-না?'

'তা হয়ত পারতে।'

'তাই বলছিলাম তিশ-চল্লিশটা রুপেয়া আমি চাই না। শাদির জন্যে খাটছি, অমন একটা লেড়কা জুটিয়ে এনে দিচ্ছি। তুই আমাকে বিশটা রুপেয়া দিস।'

কি একটা বলতে চাইল ধনপত। পারল না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হ'ল, এতদিনে সখিলালের মতলবটা বুঝতে পেরেছে। তিলিয়ার বিয়ের ব্যাপারে সখিলালের কেন যে এত উৎসাহ, এই প্রশ্নটা এতকাল তার কাছে রহস্যে আবৃত ছিল। এই মুহূর্তে প্রশ্নটার চারপাশ থেকে সমস্ত যবনিকা উঠে গেছে।

এদিকে হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সখিলাল। আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'বহুত বেলা হ'ল। এবার যাই রে ধনপত—' বলেই উঠে পড়ল সে। একমুহূর্ত আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

* * *

ধনপত ভেবেছে, সখিলালের সব মতলবই সে বুঝতে পেরেছে। তিলিয়ার বিয়ের ব্যাপারে তার যে এত উদ্যম এত উৎসাহ—সমস্তই মোটারকম একটা প্রাপ্তির আশায়। এ ছাড়া অন্য কোন অভিসন্ধি নেই।

কিন্তু ধনপত যা ভেবেছে, সখিলাল তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। মাত্র গোটা কুড়ি টাকা আদায় করাই তার উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য আরো গভীর আরো ব্যাপক।

সখিলাল-চরিত অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বস্তু। নিজের চারপাশে সহৃদয়তার আবরণ এঁটে সে আত্মগোপন করে থাকে। সেই আরবণ ভেদ করে আসল মানুষটাকে আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার।

ধনপতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়ির দিকে চলেছে সখিলাল বেলা বেশ চড়েছে। রোদ দেখা দিয়েছে। গা থেকে কম্বলটা খুলে কাঁধের ওপর রাখল সে।

এই মুহূর্তে তার মনে বিচিত্র ভাবনার খেলা চলেছে। সে ভাবছে, ভালয় ভালয় সোনাহুরুদের মেয়ে তিলিয়া তার ভূঁইহার জগনপ্রসাদের বিয়েটা দিতে পারলেই তার এতদিনের ইচ্ছাটা পূরণ হয়।

দেশে আজাদি এসে গেছে। জাতের বিচার নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। আইনের চোখে সব মানুষই এখন সমান। তা ছাড়া লোকের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যাচ্ছে। তারা বুঝতে শিখছে মানুষের পরিচয় সে নিজে, তার জাত নয়। ফলে শহরে শহরে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের বিয়ে প্রায় হচ্ছে। এসব কথা সখিলাল জানে। আবার এ-ও জানে মধ্যপ্রদেশের এই অর্বাচীন গ্রাম বিশাল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। শিক্ষা-দীক্ষা স্বাধীনতার দীপ্তি—সমস্ত কিছু থেকেই সে বঞ্চিত। নতুন যুগের তরঙ্গ এখন পর্যন্ত তার ধমনীতে সাড়া তোলে নি। পুরনো আচার আর জীর্ণ সংস্কার নিয়ে গ্রামটা যেন হাজার বছর পিছিয়ে আছে। বিপুল দেশের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্রই নেই।

সখিলাল জানে, সোনাহুরুদের মেয়ে তিলিয়ার সঙ্গে ভূঁইহারের ছেলে জগনপ্রসাদের বিয়ে হ'লে হুলস্থুল পড়ে যাবে। এ-রকম বিয়ে এ গ্রামে আর কখনও হয় নি। এ-রকম যে হওয়া সম্ভব, আইন এবং মানবতার দিক থেকেও যে এ উচিত, এখানকার মানুষ তা জানে না। শহর-বন্দর থেকে কোনদিন কেউ এসে এ-কথাটা তাদের জানিয়ে যায় নি।

এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের বিয়ে দিলেই গ্রামের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন লোকগুলো ক্ষেপে উঠবে। তাদের চোখে এ বিয়ে প্রথা-বিরুদ্ধ।

সখিলাল ভাবতে লাগল, তার পরামর্শেই অবশ্য এই বিয়ে হতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনমতেই সে ধরাছোঁয়া দেবে না। আড়ালে থেকে সে পরামর্শ দিয়েছে, বিপদের সময় আড়ালেই থেকে যাবে। ধনপত

যদি তার কথা বলে, বেমালুম অস্বীকার করবে।

আপাত চোখে বিয়েটা দিচ্ছে ধনপত। তার আর নিস্তার নেই। গ্রামের লোক তাকে ক্ষমা করবে না। সখিলালের স্থির বিশ্বাস তাকে গ্রামছাড়া হতেই হবে। ধনপত যাতে নিঃসম্বল হয়ে গ্রাম ছাড়ে তার ব্যবস্থা সে করবে।

নিঃস্ব অবস্থায় ধনপত যদি এখান থেকে চলে যায় সখিলালের পক্ষেই মঙ্গল। এই বুড়ো বয়সে গ্রামের বাইরে গিয়ে সে পেট আর আশ্রয়ের চিন্তাই করবে, না মামলার কথা ভাববে?

একটা ব্যাপারে সখিলাল নিশ্চিন্ত, একবার এখনে থেকে তাড়াতে পারলে ধনপতের পক্ষে মামলা চালানো সম্ভব হবে না। ফল হবে এই, পনের বছর ধরে যে দেড় বিঘা জমি নিয়ে ঝঞ্ঝাট চলছে এবারে সেটা হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

চলতে চলতে খুশিতে আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল সখিলাল। মনে মনে এ-রকম একটা ষড়যন্ত্র সে পাকাতে পেরেছে, সে জন্য নিজেকে হাজার বার তারিফ করল। ভাবতে লাগল, অন্যের সর্বনাশের সুযোগে নিজের স্বার্থ যে উদ্ধার করতে পারে জগতে তার মত বুদ্ধিমান আর কে?

একুশ

এমনি করেই বুঝি কঠিন তুষার গলে। আর যখন গলে তখন নিজে তো ভেসে যায়ই, সামনে যা কিছু পায় তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ছকুরামের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। এতকাল তার বুকের ভেতরটা ছিল বরফের মতই শক্ত স্তব্ধ আর শীতল। এই মরসুমে গোরীগাঁও এসে তিলিয়াকে দেখল সে। শুধু দেখলই না, তার স্নেহ আর সেবার উত্তাপও পেল। ফল হ'ল এই ছকুরামের অজান্তে তার বুকের স্তম্ভিত শীতলতার জগতে ফাটল ধরতে শুরু করল।

যত দিন যেতে লাগল কঠিন তুষার ততই ফাটতে লাগল, ভাঙতে

লাগল, গলতে লাগল। এই ভাঙা আর গলার লীলা চলছিল ছকুরামের অলক্ষ্যে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এবং ধীরে ধীরে। কিন্তু কোণ্ডার্গাঁও গিয়ে যেদিন সে রাজুয়ার সুদ রেহাই দিয়ে এল সেদিন এই ভাঙার পালা শেষ হ'ল। এক নিমেষে তার যত কাঠিন্য আর স্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল।

বিশাল পৃথিবীর কাছে কোণ্ডার্গাঁও-এর সেই ঘটনাটির হয়ত কোন মূল্যই নেই। কিন্তু ছকুরাম নামে একটি ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জগতে সেই সামান্য ঘটনাটি বিপুল আলোড়ন নিয়ে এসেছে।

কোণ্ডার্গাঁও থেকে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে ছকুরাম। যেন জন্মান্তর ঘটে গেছে তার।

আগে খাতক ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতো না সে। ইদানীং আভনপুরের গঞ্জে এসে একে-ওকে ডেকে কথা বলে। যারা অপরিচিত, প্রয়োজন থাক আর না-ই থাক তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করে।

ছকুরামের মুখোমুখি যে চালাটা সেখানে বেনারসের শেঠ ব্রিজলালের মনিহারি দোকান। ব্রিজলাল অনেকবার তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছকুরামের দিক থেকে কোনরকম উৎসাহ পাওয়া যায় নি। উৎসাহ না পাবার কারণও আছে। ব্রিজলাল তার খাতক নয়। উপরন্তু তাকে ধার দিতে গিয়ে ছকুরাম সুবিধা করতে পারে নি। শুধু শুধু অপ্রয়োজনে কারো সঙ্গে আলাপ করা তার রীতিবিরুদ্ধ।

একদিন সকালে উপযাচক হয়ে ছকুরাম ব্রিজলালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'রাম রাম বিরিজলালজ—'

'আরে কৌন!' নিজের চোখদুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্রিজলাল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েই রইল।

'আমি ছকুরাম।'

ব্রিজলাল লোকটা ভারি রসিক। চোখদুটো ভাল করে রগড়ে খুব কাছে এসে বলল, 'সচ্ বলছ!'

ছকুরাম কিছু বলল না। হাসতে লাগল।

ব্রিজলাল শুধলো, তারপর কি মনে করে ?'

'কিছু মনে করে না। স্রিফ এমনি এলাম, আড্ডা দিতে।'

'এসো-এসো—' ছকুরামের হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে বসাল ব্রিজলাল।

একদিন সে গেল বুড়ো ইন্দর সিং-এর কাছে। ইন্দরের খেলনার দোকান।

ছকুরাম বলল, 'তবিয়ত কেমন সিংজি ?'

লোকটা কোনদিন তার কাছে আসে না, আজ এসে হঠাৎ কুশল জিজ্ঞাসা করছে। একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল ইন্দর সিং। তারপর বলে উঠল, 'গুরুজি যেমন রেখেছে—'

'বেচাকেনা কেমন চলছে ?'

'গুরুজির দয়ায় ভালই।'

ইন্দর সিং-এর সব কথায় গুরুজির উল্লেখ থাকে।

বতিয়া নদার পাব ঘেঁসে এ-বছর একখানা নতুন কাপড়ের দোকান বসেছে। ছকুরাম সেখানে গিয়েও একদিন হাজির হ'ল।

দোকানদারের বয়স বেশি নয়; তিরিশের নীচেই হবে। দেখেই বোঝা যায় গুজরাতি। ফর্সা টুকটুকে রঙ। টানা-টানা ভ্রূ, তীক্ষ্ণ নাক, দীর্ঘ চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি। তার সমস্ত শরীর ঘিরে এমন কিছু আছে যা আকর্ষণ করে, নিমেষে মনকে মুগ্ধ করে দেয়।

ছকুরাম শুধলো, 'নাম কি আপনার ?'

'মানেক শা।' দোকানদার উত্তর দিল।

'আগে তো আপনাকে এখানে দেখি নি।'

'আগে আর কখনও এখানে আসি নি। এই প্রথম এসে দোকান খুলেছি।'

'ব্যাওসা কেমন চলেছে ?'

'মোটামুটি মন্দ না। তবে—' বলতে বলতে চুপ করল মানেক শা।

'কী ?' ছকুরাম উদ্‌গ্রীব হ'ল।

'খদ্দেররা বড্ড বেশি ধারে জিনিস চায়। এ সাল নেবে, আসছে সাল রুপেয়া দেবে।'

'এখানকায় রেওয়াজই এ রকম।'

'পয়লা এসেছি, হাল চাল কিছুই জানি না। ধার দেব কি না বুঝতে পারছি না।'

'আঁখ বুজে দিতে পারেন। এখানকার মানুষ খুব সৎ। একটা আধলা মার যাবে না।'

'সচ্‌ বলছেন ?'

দৃঢ় গলায় ছকুরাম বলল, 'হাঁ, মিছা বলতে যাব কেন ? দশ সাল এখান আসাছি। এখানকার লোকগুলোকে খুব ভাল করে চিনি। এরা কারোকে ঠকায় না। এই আমার কথাই ধরুন না, সুদের কারবার করি। লোকের কাছে বছরের পর বছর কত রুপেয়া পড়ে থাকে। কোনদিন একটা পয়সাও মার যায় নি।'

'যাক, আপনার কাছে ভরসা পেলাম। এবার থেকে ধারেই মাল দেব।' মানেক শা'র গলায় স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল।

এমন কি যে বিরজাকে ছকুরাম চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে, সে-ও বাদ গেল না। ছকুরাম তার কাছেও এল। বলল, 'শেঠিনীর খবর কি গো ?'

বিস্মিত বিরজা বলল, 'তুমি !'

'হাঁ-হাঁ আমি। চিনতে পারছ না ?' ছকুরাম হাসল।

'পারছি বৈকি।' পাঞ্জাবী শেঠিনী বিরজা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আও-আও—'

ছকুরাম কাছে গিয়ে বসল।

'এতাদিনে আমার কথা মনে পড়ল !' বলেই তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় একটা উর্দু শের গেয়ে উঠল বিরজা। যার অর্থ হ'ল, এতদিন চুল এলিয়ে চাতক পাখিটির মত তোমার আশায় বসেছিলাম। আজ আমার

কি সৌভাগ্য, তুমি এসেছ!

গান গেয়েই সে ক্ষান্ত হ'ল না। চারপাশের দোকানীদের ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'দেখ, তোমরা সবাই দেখ আমার ঘরে আজ কে এসেছে!'

'কে এসেছে?' যেন কত আগ্রহ, এমন ভাব নিয়ে একজন শুধলো।

'মেরা দিলকা পেয়ার! কেঁদে কেঁদে যার জন্যে চোখ আন্ধা করে ফেলেছিলাম।' বলেই হেসে উঠল বিরজা। সেই হাসির সঙ্গে তাল দিয়ে সমস্ত আভনপুব গঞ্জটা হাসল। এমন কি ছকুরামও বাদ রইল না।

বিরজা নামের মেয়েমানুষটা গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে দোকানদারি করে বেড়ায়। এ ছাড়া অন্য একটা পেশাও তার আছে। দিনে সে শেঠিনী, রাতে বাঘিনী। তখন তার ঘরে নানা ধরনের পুরুষের আনাগোনা হয়। তাদের নিয়েই সমস্ত রাত রাক্ষুসে মত্ততা চালায় সে। তার মত স্ত্রীলোকের যেমন হয়, মুখটা ভারি শিথিল। কোন কিছুই বলতেই আটকায় না।

ছকুরামকে নিয়ে সে একেবারে মেতে উঠল। পৃথিবীতে যত রকমের আদিম আর অশ্লীল রসিকতা থাকতে পারে তার মুখে সে-সব খইয়ের মত ফুটতে লাগল।

আশ্চর্য! বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না ছকুরাম। বরং রসিকতাগুলোর উৎকৃষ্ট জবাব দিতে লাগল।

বিরাজা, ইন্দর সিংহ, ব্রিজলাল—যার কাছেই ছকুরাম গেছে সে-ই বিস্মিত হয়েছে। অকারণে সে যে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, এ ছিল একেবারে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত।

চিরকালের অমিশুক ছকুরাম অতি মাত্রায় সামাজিক হয়ে উঠেছে। কঠিন তুষারে যে স্রোত রুদ্ধ হয়ে ছিল, হঠাৎ সেটা পথ পেয়ে গেছে।

সবাই ভাবে, কেমন করে ছকুরাম এত বদলে গেল?

শুধু কি ব্রিজলালরাই, তার খাতকেরাও অবাক হয়ে গেছে।

কেউ হয়ত এসে বলল, 'ছকুয়াজি, আগেলা দো সাল তুমহার সুদটা দিতে পারব না।'

'বেশ তো, দিও না।' অক্লেশে বলে যায় ছকুরাম।

কেউ এসে বলল, 'ছকুয়াজি, বহুত বিপদে পড়েছি। সাত রুপেয়া সুদ তুমহার পাওনা হয়েছে। বলতে শরম হচ্ছে, লেকেন না বলে উপায় নেই। ঐ সুদটা রেহা করে দিতে হবে।'

ছকুরাম বলে, 'শরমের কুছু নেই। সুদটা তুমহার রেহা করে দিলাম।'

খাতকদের প্রতি অত্যন্ত উদার হয়ে গেছে ছকুরাম।

দেখেশুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে ফির্তু। পালিত পশুর মত তার আনুগত্য। মালিকের কোনদিক থেকেই ক্ষতি হয়, ফির্তুর পক্ষে তা অসহ্য। একদিন সে বলল, 'এত সুদ রেহা করলে ব্যাওসা চলবে কেমন করে?'

ছকুরাম কিছু বলল না। অল্প একটু হাসল মাত্র।

ফির্তু থামে নি, 'এ-রকম করে কত লুকসান (লোকসান) দিবি ছকুয়াজি?'

এবার ছকুরাম মুখ খুলল, 'দুনিয়ায় কোনটা লাভ আর কোনটা লুকসান তা কি কেউ ঠিক করে বলতে পারে!'

ফির্তু জবাব দিল না। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে ভাবতে লাগল, ছকুরামের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে কি-না।

বাইশ

ছকুরামের জীবনের সমস্ত দিক জুড়ে পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

এতকাল পৃথিবীর কোন কিছু সম্পর্কেই তার জিজ্ঞাসা ছিল না। নিজের সম্বন্ধে একটা নিদিষ্ট ছক করে নিয়েছিল সে। নির্ভুল ভাবে সেই ছকটা মেনে চলত ছকুরাম। মধ্যপ্রদেশের গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে টাকা খাটিয়ে বেড়ানো, সুদ আদায়ের জন্য খাতকদের ওপরে নির্দয় উৎপীড়ন

—এর মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ ছিল। এ-সবের বাইরে যে একটা বিস্তৃত জগৎ আছে নিজেকে কোনদিনই সেখানে ছড়িয়ে দেয় নি। বরং চারপাশ থেকে একটু একটু করে জীবনটাকে গুটিয়ে এনে নিষ্ঠুর আর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল।

মানুষ সম্বন্ধে তার কৌতূহল তো ছিলই না। এমন কি এদেশে পথ চলতে গেলে পদে পদে যে মাঠ-প্রান্তর আর শালবন সামনে পড়ে, কোনদিন ভালভাবে সেগুলোও লক্ষ করে নি।

অবশ্য মাঝে মাঝে দুপুরের গনগনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে ছকুরাম। নিজের চরিত্রের সঙ্গে তার অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পেয়েছে।

দুপুরের জ্বলন্ত আকাশ ছাড়াও প্রকৃতি চারধারে বহুরূপের বিচিত্র সব মেলা সাজিয়ে রেখেছে। কোনদিন ফিরেও তাকায় নি সে।

কিন্তু ইদানীং একেবারে বদলে গেছে ছকুরাম মানুষ সম্পর্কে যেমন, প্রকৃতি সম্পর্কেও তেমনি অদম্য কৌতূহল তার। আভনপুরের কাজ সেরে গোরীগাঁও-এ ফিরতে ফিরতে আজকাল আকাশ আর দু-পাশের আদিগন্ত মাঠের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সে।

অন্যদিনের মত আজও গোরীগাঁও ফিরে চলেছে ছকুরাম। এখন বিকেল।

রাস্তার দু-দিকে যতদূর চোখ যায়, লাল মাটির প্রান্তর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটা রক্তের সমুদ্র যেন ডাকিনীমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে আছে। সবুজের কোন সমারোহই সেখানে নেই। সমারোহ দূরের কথা, নীরস মাটি ভেদ করে একটা উদ্ভিদও মাথা তুলতে পারে নি। মাটি এখানে নিঃস্ব, শূন্য। যত নিঃস্বই হোক, তবু এই প্রান্তরগুলির মধ্যে কোথায় যেন দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে।

মাথার ওপর অবারিত আকাশ। সেখানে সূর্যাস্তের মহড়া চলেছে। লাল-নীল-হলুদ—পৃথিবীতে যত রঙ আছে আকাশটা সমস্তই মেখে বসেছে।

ছকুরাম তাকিয়েই আছে। বেলাশেষের আকাশ আর প্রান্তর

তাকে বিস্মিত এবং মগ্ন করে রেখেছে।

একসময় ধনপতের বাড়ির সামনে এসে পড়ল সে। টাঙা থেকে নামতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অভাবিত দৃশ্যে চমকে উঠল ছকুরাম। এতক্ষণের বিস্ময় আর মগ্নতার রেশ এক নিমেষে কেটে গেল।

দাওয়ার ওপর একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছেলে আর একজন মধ্যবয়সী সুন্দরী স্ত্রীলোক পাশাপাশি বসে রয়েছে, তাদের মুখোমুখি বসেছে তিলিয়া। তার পাশে বুড়ো সখিলাল। একটু দূরে বশংবদ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনপত। দুই হাত জোড় করে আগন্তুক স্ত্রীলোকটিকে কি যেন বলছে সে।

পলকে বুঝে নিল ছকুরাম, জোয়ান ছেলেটি আর স্ত্রীলোকটি বিয়ের ব্যাপারে তিলিয়াকে দেখতে এসেছে।

অন্য সবার ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে তিলিয়ার ওপর ফেলল ছকুরাম। একদৃষ্টে অপলকে তার দিকে তাকিয়েই রইল।

অপরূপ দেখাচ্ছে তিলিয়াকে। পরনে চড়া রঙের ঝলমলে ঘাগরা, নীল আঙিয়া আর চুমকি বসানো হলদে দোপাট্টা। মুখে শাঁখের গুঁড়ো মেখেছে সে। চোখের কোলে সরু করে সুর্মার টান দিয়েছে। কপালে কাচ পোকার টিপ পরেছে। চুলগুলো দীর্ঘ বেণীতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

তিলিয়া বসে আছে ঠিকই। কিন্তু মাথা তুলে তাকাতে পারছে না। লজ্জায় সে নতচোখ। কুণ্ঠায় আর সঙ্কোচে সে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য তিলিয়ার মুখখানা। হৃদপিণ্ডের সমস্ত শোণিত লাফ দিয়ে সেখানে উঠে এসেছে যেন। তাই বুঝি মুখটা এত লাল, এত রক্ত বর্ণ।

দু-মাস প্রতিদিন তিলিয়াকে দেখেছে ছকুরাম। কিন্তু আজকের এই তিলিয়া যেন অন্য কেউ। যেন অজ্ঞাত এক রহস্যময়ী। দু-মাস ধরে সহস্রবার দেখেও এখনকার এই লজ্জাবতী অপরূপাকে আগে আর

কখনও আবিষ্কার করতে পারে নি সে।

তিলিয়ার বিয়ে হবে। কোনদিন এ-কথাটা ভেবে দেখে নি ছকুরাম। ভাবার কোন প্রয়োজনই হয় নি। এই মরসুমে প্রথম যখন গোরীগাঁও এসেছিল তখন সে অস্বাভাবিক আর নিরাসক্ত মানুষ। কোন ব্যাপারেই তখন তার ঔৎসুক্য নেই। ধীরে ধীরে তিলিয়া নামে সোনাছুরুদের মেয়েটা দিনের পর দিন তার চানের জল তুলে দিতে, রান্না করে রাখতে, পাশে বসিয়ে খাওয়াতে আর অপরিসীম আগ্রহে নানা প্রশ্ন করে যেতে লাগল। এমন কি তার সমস্ত অস্বাভাবিকত্ব আর নিষ্ঠুরতা ঘুচিয়ে হৃদয় নামে একটা বিস্ময়ের রাজ্যে পৌঁছে দিতে লাগল। আস্তে আস্তে এগুলো যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছকুরাম হয়ত ভেবেছিল, এমন ভাবেই চলবে।

কিন্তু অতর্কিতে নিদারুণ একটা ছন্দোপতনের মত তিলিয়ার বিয়ের প্রশ্নটা যে একদিন দেখা দিতে পারে, ছকুরামের কাছে এ ছিল অকল্পিত।

তিলিয়ার জন্যই সে সামাজিক আর সহৃদয় হয়ে উঠতে পেরেছে। সে-হেতু ছকুরামের সচেতন মনে মেয়েটার প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা আছে। সজ্ঞানে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সজ্ঞান মনের অনেক স্তর নীচে যে অদৃশ্য আর নিদ্রিত আরেকটি মন আছে, এতদিন যেখানে কিসের লীলা চলেছে, ছকুরাম জানত না। এই মুহূর্তে সেই দ্বিতীয় মনটা প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে জেগে উঠেছে। শুধু জাগেই নি, নিজের সমস্ত রহস্য অনাবৃত করে ছকুরামের সামনে মেলে ধরেছে।

একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল ছকুরাম। দ্বিতীয় মনটার ভেতর তিলিয়ার জন্য এত তৃষ্ণাও ছিল! অলক্ষ্যে আর নিঃশব্দে কখন যে তিলিয়া তার প্রাণের গভীরে তরঙ্গ তুলতে শুরু করেছিল, ছকুরাম বোঝে নি। এর নাম কি অনুরাগ? হয়ত। এর নামই কি ভালবাসা? হয়ত।

তিলিয়ার বিয়ের প্রশ্নটাকে উপলক্ষ করে নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে অকপটে জেনে নিল ছকুরাম।

দাওয়ার ওপর মেয়ে দেখানোর পালা এখনও চলছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে অত্যন্ত বিড়ম্বিত আর বঞ্চিত মনে হল ছকুরামের। বুকের ভেতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল। ছকুরাম কেঁদে উঠতে চাইল কিন্তু পারল না! গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে কান্নাটা রুদ্ধ হয়ে গেল। বেরিয়ে আসার মত একটা পথও খুঁজে পেল না।

টাঙা থেকে এখনও নামে নি ছকুরাম। নামবে কি-না বুঝতে পারছে না। একবার তার মনে হ'ল, নেমেই পড়ে। পরক্ষণেই ভাবল, আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। মেয়ে দেখার পর্ব শেষ হ'লে ফিরে আসবে।

টাঙার মুখটা ঘোরাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছকুরামকে দেখতে পেল ধনপত।

ধনপত ডাকল, 'ছকুয়া—এ ছকুয়া—' ডাকতে ডাকতে দাওয়া থেকে নেমে এল সে।

টাঙার মুখ আর ঘোরানো হ'ল না। ছকুরাম ফিরে তাকাল। বলল, 'কী বলছ?'

'এসে আবার চলে যাচ্ছ যে!'

ছকুরাম উত্তর দিল না।

ধনপত এবার তাড়া লাগাল, 'নেমে এস—'

'এখন থাক। আমি বরং একটু ঘুরেই আসি।'

'না-না, তুমি নাম। এখন তুমহাকে কোথাও ঘুরতে যেতে হবে না।'

একরকম জোর করেই ছকুরামকে টাঙা থেকে নামিয়ে আনল ধনপত। দাওয়ার দিকে যেতে যেতে বলল, 'তুমহাকে একটা কথা বলা হয়নি ছকুয়া।'

'কী?' ছকুরাম মুখ তুলে তাকাল।

'এই তিলিয়ার ব্যাপারে। ওর বিয়ের ঠিক করেছি। আজ ওকে দেখতে এসেছে।'

ছকুরাম হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। তার মনে হ'তে

লাগল, ধনপত তাকে প্রতারণা করেছে। অতি সঙ্গত একটা পাওনা থেকে ষড়যন্ত্র করে বঞ্চিত করেছে। নিজের বুকের ভেতর অদ্ভুত এক শূন্যতা বোধ করল সে।

কখন যেন উঠান পেরিয়ে দাওয়ায় এসে বসেছে ছকুরাম। ধনপত জগনপ্রসাদ আর সুভদ্রার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। হাত তুলে জগনরা নমস্কার করছে। কিন্তু প্রতি-নমস্কার জানানো যে একটা সাধারণ ভদ্রতা এই মুহূর্তে তা ভুলে গেছে ছকুরাম। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে নিশ্চল জড়ের মত বসেই আছে সে।

ছকুরামের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জগনরা ভাবল, লোকটা হয়ত দাম্ভিক হয়ত অভদ্র কিংবা নির্বোধ। যা-ই ভাবুক, ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। ছকুরামকে নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। যে জন্য তারা এখানে এসেছে সেই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে গেল।

সুভদ্রা বলল, 'লেড়কি আমার পসন্দ হয়েছে ধনপতজি।'

হাত জোড় করে দীন ভঙ্গিতে ধনপত বলল, 'আপনার কিরপা (কৃপা)।'

'আসছে মাসেই ওকে আমার ঘরে নিতে চাই। আপনার আপত্তি আছে ?'

'না-না, আপত্তি থাকবে কেন। এ তো ভাগ্যির কথা।'

'তা হ'লে—' কি বলতে গিয়ে চুপ করল সুভদ্রা।

'তা হলে কী ?' ধনপত শুধলো।

'একটা কথা—'

'বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না সুভদ্রা। খুব সম্ভব নিজের মনে বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে আরম্ভ করল, 'আমাদের সমাজে একটা নিয়ম আছে।'

'কী নিয়ম ?' ধনপত উদ্গ্রীব হ'ল।

'ছেলের বিয়েতে আমরা পণ নি। জগনের জন্য আপনাকে এক শ রুপেয়া পণ দিতে হবে।'

পণ যে দিতে হবে, আগেই সখিলালের কাছে তার আভাস পেয়েছিল ধনপত। বলল, 'এক শ রুপেয়াই!'

'হাঁ।' ধনপতের চোখে চোখ রেখে অল্প একটু হাসল সুভদ্রা। বলতে লাগল, 'আমার ছেলে দেখেছেন, ঘর-বাড়ি-ক্ষেতি দেখেছেন। এক শ টাকা পণ কি খুব বেশি হ'ল!' তার গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার রয়েছে।

'না-না সে কথা নয়—' থতমত খেয়ে থেমে গেল ধনপত।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এদিকে পৌষের বিকেল চুপিসাড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সন্ধে নেমে আসছে। মিহি ঝাপসা অন্ধকারে আকাশটা ডুবে যাচ্ছে। একটু আগেও সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল। এখন আর সে নেই। বস্তার জেলার ওপাশে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে, সেখানে অদৃশ্য হয়েছে।

হঠাৎ সুভদ্রা বলে উঠল, 'সন্ধে হয়ে এল। এবার আমাদের উঠতে হবে।'

'এখনি উঠবেন?' ধনপত বলল।

'হাঁ, আগে উঠলেই ভাল হত। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'তা হ'লে শাদির কি হবে!'

'শাদি হবে। আমি গিয়ে একটা দিন ঠিক করে আপনাকে জানিয়ে দেব। তবে—'

'কী?'

'পণের টাকাটার কথা কিন্তু মনে রাখবেন।' সামান্য হাসল সুভদ্রা।

ধনপত কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল, সুভদ্রা নামে এই স্ত্রীলোকটির স্নায়ু অত্যন্ত সজাগ। নিজের দাবীর কথা সে কিছুতেই ভোলে না।

একসময় সুভদ্রারা ভরতপুর রওনা হ'ল। মোষের গাড়ি করে তারা এসেছিল, সেই গাড়িতেই চলে গেল।

সখিলাল আর ধনপত তাদের এগিয়ে দিতে গেছে।

এখন দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে আছে দু-জনে। অর্থাৎ তিলিয়া আর ছকুরাম।

এদিকে সন্ধে হয়ে গেছে। চারপাশের প্রান্তরগুলো অন্ধকারে অবলুপ্ত। আকাশটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। এক কোণে ঐ যে বড় তারাটা জ্বলজ্বল করছে, কি নাম তার? খুব সম্ভব বশিষ্ঠ। অনেকদূরের ছোট তারাটা? হয়ত অরুন্ধতী। উঠানের আঁওলা গাছের ফাঁক দিয়ে যাকে দেখা যাচ্ছে, সে কে? লুব্ধক বুঝিবা।

পুব দিক থেকে হাওয়া দিয়েছে। আঁওলা গাছের পাতা কাঁপছে। কুয়ার কাছে পিপুল গাছটা অল্প অল্প দুলছে।

আজ ত্রয়োদশী। দেখতে দেখতে চাঁদ উঠে গেল। অন্ধকারের যবনিকা সরে যাচ্ছে। লাল মাটির প্রান্তরে চাঁদের আলো বিচিত্র এক মায়াবরণ টেনে দিতে শুরু করেছে।

কোনদিকে লক্ষ নেই ছকুরামের। এমন কি তিলিয়ার দিকেও সে তাকাচ্ছে না। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে নিঃস্ব বঞ্চিত এবং পরাভূতের মত বসে আছে।

ছকুরামের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তিলিয়া। বার বার তাকে ডাকতে চাইছে কিন্তু পারছে না। গলার স্বরটা যেন তার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে।

পাশাপাশি দু-জনে বসেই আছে। কখন সন্ধেটা রাত্রি হয়ে গেছে, কখন তারা ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, তারা জানে না। তাদের মাঝখানে সময় নেই, শব্দ নেই, জীবনের কোন লক্ষণ নেই। সময় এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর এক স্তব্ধতা শূন্যতা আর শীতলতা দুটি মানুষকে কোন অতল গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাণপণে অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর গলায় স্বর ফুটল তিলিয়ার।

সমস্ত শূন্যতা আর স্তব্ধতাকে অস্বীকার করে রুদ্ধশ্বাসে সে ডাকল, 'ছকুয়াজি—'

ছকুরাম জবাব দিল না।

তিলিয়া ডাকতে লাগল, 'ছকুয়াজি—ছকুয়াজি—'

ছকুরাম মুখ ফেরাল না। ভাবলেশহীন অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর ডাকল না তিলিয়া। দুই হাতে মুখ ঢেকে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল। ফোঁপানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ফোঁপানি একটু কমলে সে বলল, 'বাপুজি যে আমার শাদির জন্যে এতদূর এগিয়েছে জানতাম না। রামজি কসম, ভগোয়ান কসম।' কান্নার তরঙ্গে তার স্বরটা ভেঙে যেতে লাগল।

কথাগুলো বলেই আর বসল না তিলিয়া। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করল।

তেইশ

কখন যে ফুলটা ফুটেছিল, ছকুরাম বুঝতে পারে নি।

এবার প্রথম যেদিন সে গোরীগাঁও আসে সেদিন থেকেই বুঝি শুরু তারপর দু-মাস ধরে প্রতিদিন একটু একটু করে কোথায় এক অদৃশ্য অন্তঃপুরে ফুলটা ফুটিয়েছে তিলিয়া। সেবার প্রীতিতে আর অপরিসীম স্নেহে একটা করে দল মেলে দিয়েছে। ছকুরাম টের পায় নি।

আজ বিকেলে যখন সে এসে দেখল সুভদ্রারা তিলিয়াকে দেখতে এসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনের ওপর থেকে একটা আবরণ সরে গেছে। অন্তঃপুরের সেই ফুলটা চোখে পড়েছে। ফুলটা ছকুরামের জীবনের সমস্ত রঙ সমস্ত তৃষ্ণা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডগডগ করছিল।

তিলিয়ার জন্য তার প্রাণ যে এত উন্মুখ এত লালায়িত ছিল, ছকুরাম জানত না। জানত না, সোনাছুরুদের মেয়েটা তার জীবনের

গভীরে এত ঝঙ্কার এত তরঙ্গ তুলেছে। জানত না, রক্ত-মাংস-মন নিয়ে তার যে অস্তিত্ব তিলিয়া তা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। আজ বিকেলে নিজের মনটা যখন আবিষ্কৃত হ'ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জগনপ্রসাদের সঙ্গে তিলিয়ার বিয়ে হবে, ভাবতেই নিজেকে ভারি অসহায় মনে হয়েছে ছকুরামের। জীবনে কোনদিন কারো স্নেহ পায়নি সে। গোরীগাঁও এসে যদিও বা পেল, তা এত ক্ষণস্থায়ী কেন? কেন?

তিলিয়া ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। হাঁটুর ফাঁকে ঘাড় গুঁজে বসেই আছে ছকুরাম।

সুভদ্রাদের এগিয়ে দিয়ে একসময় ফিরে এল ধনপত। সে একাই এসেছে। সখিলাল সঙ্গে নেই। সম্ভবত সে তার বাড়ি চলে গেছে।

ধনপত পাশে এসে বসল। ডাকল, 'ছকুয়া—'

ছকুরাম উত্তর দিল না।

ধনপত আর ডাকাডাকি করল না। নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'এতদিনে রামজি কিরপা করেছে। তিলিয়ার শাদির একটা ব্যবস্থা হ'ল। লেড়কিটাকে নিয়ে কি ভাবনাতেই যে পড়েছিলাম!'

ছকুরাম কিছুই বলল না।

ধনপত থামে নি, 'মেয়েটার কপাল ভাল। যে ঘরে যাচ্ছে কোন কিছুর অভাব নেই সেখানে। বিশ বিঘা ক্ষেতি, দশ-দশটা ভঁইসা, নিজেদের বাড়ি। তিলিয়া সুখেই থাকবে। না কি বল ছকুরাম?'

আবছা আবছা চাঁদের আলোতে ছকুরামের মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যদি যেত, এমন একটা প্রশ্ন করতে সাহস হ'ত না ধনপতের। সীমাহীন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত সে।

ছকুরামের জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না ধনপত। আজ যেন তাকে কথায় পেয়েছে। সমানে বলে যাচ্ছে সে, 'কত কষ্ট করে যে ছেলেটা জোগাড় করেছি শুধু আমিই জানি। জগনপরসাদ অবশ্য তিলিয়ার স্বজাত নয়। না হোক, আজকাল ভিন জাতের মধ্যে শাদির চল হয়েছে।'

অর্ধস্ফুট গলায় বিড় বিড় করে কি যেন বলল ছকুরাম। তার

কথা কিছুই বোঝা গেল না। তবু উৎসাহিত হয়ে উঠল ধনপত। নতুন উদ্যমে আবার শুরু করল, 'জগনপরসাদকে তো তুমি দেখলে। কি চমৎকার চেহারা! সারা গোরীগাঁও খুঁজে এস, কারো ঘরে এমন জামাই পাবে না।' খুশিতে তার গলাটা ডগমগ।

নিজের মনে আরো কিছুক্ষণ বকে গেল ধনপত। তারপর হঠাৎ একসময় তার হুঁশ হল, অনেক রাত হয়ে গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ প্রায় উঠানের ওপর এসে পড়েছে।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে ধনপত ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে বাপ কত রাত হয়ে গেছে। চল ছকুয়া, ঘরে চল।' বলেই উঠে পড়ল সে। দেখাদেখি ছকুরামও উঠল।

ঘরে এসে লণ্ঠন জ্বালল ধনপত। বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে এস, খাওয়া-দাওয়া কর। আমিও খেয়ে আসি।'

অন্যদিন তিলিয়া ছকুরামকে কাছে বসে খাওয়ায়। আজ তাকে দেখা যাচ্ছে না। সেই যে ঘরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করেছে, আর খোলে নি।

খাওয়ায় স্পৃহা একেবারেই নেই ছকুরামের। সমস্ত দিন আগুনপুরে কাটিয়ে এসেছে। ঘামে-ধুলোয় শরীরটা চটচটে। তবু সে চান করে এল না। এককোণে বিছানা পাততে পাততে বলল, 'আজ আর খাব না।'

'খাবে না কেন? শরীর খারাপ নাকি?' ঈষৎ উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল ধনপত।

'শরীর ঠিকই আছে।'

'তবে?'

'এমনিই খাব না। খাবার ইচ্ছে নেই।' বলতে বলতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ছকুরাম।

ধনপত এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে আরে শুয়ে পড়লে যে! কিছু অন্তত খেয়ে নাও। তামাম রাত না খেয়ে কাটালে ভারি কষ্ট হবে।'

ছকুরাম জবাব দিল না। কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে রইল ধনপত। বুঝল, আর কিছু বলা বৃথা। হাজার বললেও ছকুরাম খাবে না।

একসময় দুর্বোধ্য জড়িত স্বরে বিড় বিড় করতে করতে তিলিয়ার খোঁজে চলে গেল ধনপত। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার।

আর শুয়ে শুয়ে ছকুরাম শুধু ভাবছে, তিলিয়ার বিয়ে হবে, হয়ত ঐ জগনপ্রসাদের সঙ্গেই। ভাবতে গিয়েই সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হ'তে লাগল তার। মনে হ'ল, শ্বাসটা বন্ধ হয়ে আসছে।

এক সময় বিড় বিড় করতে করতে আবার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল ধনপত, 'এ ঘরে ছকুয়া না খেয়ে রইল, ও ঘরে তিলিয়া। এত করে বললাম, কেউ খেল না। কি হয়েছে তাদের ভগোয়ান জানে!'

তিলিয়া না খেয়ে রয়েছে! ছকুরাম এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে রইল। পরক্ষণেই তার মন বলল, তবে কি সোনাছকুদের মেয়েটাও তার মতই—

এদিকে বিড় বিড় করতে করতে বিছানা পেতে নিল ধনপত। তার ওপর বসে মৌজ করে দিনের শেষ চুট্টাটি ধরিয়ে ফুঁকতে লাগল। নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ সে ডাকল, 'ছকুয়া—'

'বল।' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ছকুরাম।

'এখনো ঘুমোও নি?'

'না।' সংক্ষেপে জবাব সারল ছকুরাম।

চুট্টাটা শেষ হয়ে এসেছিল। সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে ধনপত শুরু করল, 'তখন পুছলাম (জিগ্যেস করলাম) লেকেন তুমি তো কিছুই বললে না।'

'কী বলব?'

'কেমন দেখলে সব?'

'কী দেখলাম?' ছকুরাম প্রশ্ন করল।

'অই জগনপরসাদকে—'

ছকুরাম কিছু বলল না।

ধনপত বলল, 'তিলিয়ার পাশে জগনকে সুন্দর মানাবে। যেন রাম ঔর সীতা।' তার গলাটা উচ্ছ্বসিত শোনাল।

এবারও ছকুরাম উত্তর দিল না।

ধনপত নিজের মনেই বকে যাচ্ছে, 'সংসারে কোন ঝামেলা নেই। দুটো মাত্তর লোক, মা ঔর বেটা। অবস্থাও খুব ভাল। দশ-দশটা ভঁইসা, বিশ-পঁচশ বিঘে ক্ষেতি, তিনটে গাই, নিজেদের বাড়ি। মনে হচ্ছে এতদিনে তিলিয়ার সব দুখ ঘুচবে। কি বল ছকুয়া!'

প্রাণপণে কী যেন বলতে চেষ্টা করল ছকুরাম। পারল না। গলার মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ গোঙানির মত একটা শব্দ বেরুল মাত্র।

ধনপত বলতে লাগল, 'সবই ভাল। লেকেন একটা মুশকিল হয়েছে। শ-ও রুপেয়া পণ চাইছে জগনের মা।' একটু আগে তার গলাটা খুশিতে উচ্ছ্বসিত ছিল। এখন কেমন যেন বিমর্ষ শোনাচ্ছে, 'অত রুপেয়া যে কোথা থেকে জোগাড় করব!' বলেই শুয়ে পড়ল সে।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। বাইরে পঞ্চম ঋতুর রাত্রিটা ঝিমঝিম করছে। চারপাশ স্তব্ধ, কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মধ্যপ্রদেশের এই গ্রামখানা এখন নিশুতিপুর।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ধনপত বলে উঠল, 'ছকুয়া—'

'বল—।'

'পোষ মাস শেষ হ'তে চলল। মাঘ মাস পড়লেই তো আভনপুরের মরসুম খতম হয়ে যাবে। তাই না?'

'হাঁ।' ছকুরাম বলল।

'মরসুম খতম হ'লেই কিন্তু এবার তোমার যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'জগনপরসাদের মায়ের ইচ্ছে মাঘ মাসের মাঝামাঝি একটা দিন দেখে তিলিয়া আর জগনের শাদি হ্যায়। আমারও সে রকম ইচ্ছে।' ধনপত বলতে লাগল, 'তাই বলছিলাম শাদির সময়টা তোমার এখানে থাকতে হবে। কোনদিন তুমি আমার কোন কথা রাখ নি। এই

কথাটা কিন্তু রাখতেই হবে। তোমার কোন আপত্তিই শুনব না।'

ছকুরাম উত্তর দিল না।

ধনপত এবার তাড়া লাগাল, 'কি, মুখ বুজিয়ে রইলে যে—'

ধনপতের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ছকুরাম, 'চুপ কর চুপ কর, এ-সব শুনতে আমার ভাল লাগছে না।'

ধনপত কি করবে, ভেবে পেল না। অন্ধকারে শুধু বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

চব্বিশ

পরের দিন ছকুরাম আভনপুর গেল না। ভোরবেলা টাটু টাকে ঘর থেকে বার করে উঠানে ছেড়ে দিল। তারপর দাওয়ায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ যেদিকেই তাকান যাক, কোথায় কোন সীমারেখা নেই। সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করে দিয়ে স্তরীভূত গাঢ় কুয়াশা চারপাশে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। দিনের প্রথম রোদ এখনও গোরীগাঁও এসে পৌছয় নি।

কতক্ষণ যে ছকুরাম বসে ছিল, খেয়াল নেই। কখন যে কুয়াশা সরে গিয়ে রোদের ঢল নেমে গেছে সে জানে না। অর্ধচেতন শূন্য চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে তো বসেই আছে। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হয়, তার দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়ে গেছে।

হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'ছকুয়া—'

ছকুরাম শুনতে পেল না। আচ্ছন্নের মত বসেই রইল।

ডাকটা আবার ভেসে এল, 'ছকুয়া—ছকুয়া—'

সে ডাকছে সে এবার গলার স্বরটাকে অনেকখানি চড়ায় তুলেছে।

এবার ডাকটা কানে গেছে। ছকুরাম চমকে উঠল। পিছন

ফিরতেই দেখতে পেল ধনপত দাঁড়িয়ে আছে।

একটু আগে ধনপতের ঘুম ভেঙেছে। বিছানা তুলে বাইরে এসে ছকুরামকে বসে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। অবাক হবারই কথা। দশ বছরে দশটা মরসুম ছকুরাম এখানে আসছে। এর আগে কোনদিন সকালবেলা তাকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায় নি। ঘুম থেকে উঠেই একটা মুহূর্তও সে দেরী করে না। টাঙা নিয়ে সোজা আভনপুর চলে যায়। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

আজ কিন্তু নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটেছে। কী ব্যাপার কে জানে! মনে মনে চিন্তিত হ'ল ধনপত। বলল, 'আজ আভনপুর যাবে না ?'

'না।' ছকুরাম উত্তর দিল। গলার স্বরটা তার কেমন যেন ভাঙা ভাঙা এবং ভারী।

'কেন ?' ধনপত প্রশ্ন করল।

নিস্পৃহ মুখে ছকুরাম বলল, 'এমনিই।'

এতক্ষণ লক্ষ করে নি ধনপত। হঠাৎ ছকুরামের মুখের ওপর তার নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বোবা হয়ে গেল সে।

ছকুরামের চোখ দুটো রক্তবর্ণ, দৃষ্টিটা উন্মাদের মত। সেই দৃষ্টির সঙ্গে খানিকটা জ্বালা মিশে আছে। চুলগুলো উসকো-খুসকো, রুক্ষ। কণ্ঠার হাড়দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। গাল বসে গেছে। সব মিলিয়ে ছকুরাম কেমন যেন উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ধনপত। তারপর ভয়ে ভয়ে ঈষৎ কাঁপা গলায় শুধলো, 'কি ব্যাপার, সারারাত ঘুমোও নি ?'

'না।' খুব আস্তে বলল ছকুরাম।

'কেন, কি হয়েছে ?' ধনপতের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরুল।

'হয়েছে আমার মরণ।' ছকুরামের গলার স্বরটা অতল খাদ থেকে যেন ফিসফিস করে উঠল।

তার সেই ফিসফিসানি এত অস্পষ্ট যে কিছুই শুনতে পেল না ধনপত। সামনে এগিয়ে এসে সে প্রশ্ন করল, 'কী বললে ?'

ছকুরাম জবাব দিল না।

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

কি যেন ভেবে ধনপতই আবার আরম্ভ করল, 'সারারাত ঘুমোও নি। আঁখ দুটো লাল হয়ে আছে। এক কাজ কর ছকুয়া—'

'কী?' ছকুরাম মুখ তুলল।

'চান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে টানা একটা ঘুম লাগিয়ে দাও। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।' বলেই আর দাঁড়াল না ধনপত। ডানপাশের ঘর থেকে মোষ দুটোকে বার করে মাঠের দিকে চলে গেল।

ধনপত বলে গেল বটে কিন্তু চান খাওয়া এবং ঘুম—কোনটার জন্যই ছকুরামকে উৎসাহিত হতে দেখা গেল না। একটু আগে যেমন ছিল তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল। এদিকে পৌষের সূর্য সোজা মাথার ওপর এসে উঠেছে। বেলা এখন দুপুর।

একসময় ছকুরামের খেয়াল হ'ল, সেই ভোর থেকে সে এখানে বসে আছে, অথচ তিলিয়াকে একবারও দেখে নি। মেয়েটা আদৌ বাড়িতে আছে কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। খুব সম্ভব সে বাড়িতে নেই। যদি থাকত, তার চুড়ির আওয়াজ কিংবা চলার শব্দ অন্তত গুনগুনিয়ে-ওঠা দু-একটা দেহাতী গানের সুর শুনতে পাওয়া যেত।

হঠাৎ উঠে পড়ল ছকুরাম। উঠান এবং কুয়ার কাছটা ভাল করে দেখে বাঁ-পাশের ঘরখানায় উঁকি মারল। ভেতরের আবছা আবছা অন্ধকারে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দৃশ্যটা যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে নিশ্চল একটা মূর্তির মত বসে রয়েছে তিলিয়া। বসার ভঙ্গিটা ভারি শিথিল ভারি ক্লান্ত। প্রকাণ্ড খোঁপাটা ভেঙেচুরে বিস্রস্ত হয়ে মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে মুখটা প্রায় ঢাকা।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছকুরাম। একসময় ফিসফিস করে ডাকল, 'তিলিয়া—'

তিলিয়া মুখ তুলল না। সাড়াও দিল না।

একটু ইতস্তত করল ছকুরাম। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। খুব কাছে এসে আবার ডাকল, 'তিলিয়া—'

মুখটা তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল তিলিয়া। এলোমেলো চুলের ফাঁক দিয়ে চকিতের জন্য ছকুরাম দেখতে পেল, মেয়েটার চোখদুটো ফোলা ফোলা, আরক্ত। গালের ওপর চোখের জল শুকিয়ে দাগ হয়ে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, অনেকক্ষণ কেঁদেছে সে।

এই মুহূর্তে কি করা উচিত, ঠিক করে উঠতে পারল না ছকুরাম। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল সে। তারপর গাঢ় গভীর বিষণ্ণ গলায় বলে উঠল, 'এ কি হ'ল তিলিয়া!'

তিলিয়াও সেই কথাটাই ভাবছিল। এ কি হয়ে গেল তার। এমন একটা কিছু যে হবে বা হ'তে পারে কোনদিন সে ধারণা তার ছিল না।

ছকুরামকে নিয়ে বিচিত্র এক খেলায় মেতেছিল সে। কিন্তু খেলাটা যে এত নিদারুণ এত গভীর-সঞ্চারী, এতকাল তিলিয়া বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারে নি ছকুরামকে রেঁধে খাওয়ানো, তার জন্য চানের জল তুলে রাখা, বিছানা পেতে দেওয়া—এই সব কাজের মধ্যে কবে কখন প্রাণের সবটুকু তৃষ্ণা আর উত্তাপ মিশিয়ে দিয়েছিল। নিজের মনটা চিরকালই অবোধ্য থেকে যেত যদি না জগনপ্রসাদ আর সুভদ্রা কাল বিকেলে তাকে দেখতে আসত।

জগনপ্রসাদরা কাল যখন তাকে দেখতে এল সেই মুহূর্তে প্রবল একটা ধাক্কা খেয়েছিল তিলিয়া। সেই ধাক্কায় তার বুকের ভেতরে একটা রুদ্ধ অংশের দরজা খুলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল সে। এতদিন যা ছিল প্রচ্ছন্ন যা ছিল মনের অগোচরে নিমেষে সেটা উন্মুক্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

নিজের বুকের ভেতরটা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তিলিয়া অনুভব করেছে তার আঠারো বছরের যৌবন ছকুরামকে ঘিরে আকুল হয়ে আছে।

ছকুরাম তার জীবনের প্রথম পুরুষ। তাকে একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুলেছে তিলিয়া। তার মধ্যে যত

নিষ্ঠুরতা আর অস্বাভাবিকত্ব ছিল, সমস্তই ঘুচিয়ে দিয়েছে।

ছকুরাম এখন চমৎকার হৃদয়বান মানুষ। কিন্তু নিজের সৃষ্টি এই নতুন মানুষটিকে সে পাবে না, এ-কথা যত ভেবেছে ততই অস্থির হয়ে উঠেছে তিলিয়া। কাল সারা রাত কেঁদেছে সে। আজ এতখানি বেলা হয়েছে, এখনও ঘর থেকে বেরোয় নি।

ছকুরাম আবার বলল, 'এ কি হ'ল তিলিয়া!'

তিলিয়া উত্তর দিল না। নতচোখে বসেই রইল। তার ঠোঁট দুটো শক্তবদ্ধ। মন হয়, সে বোবা হয়ে গেছে।

প্রায় দু-মাস ধরে তিলিয়াকে দেখছে ছকুরাম। এমন মেয়ে সমস্ত জীবনে আর কখনও দেখেনি সে। মেয়েটা সবসময় প্রগলভ, মুখর এবং কৌতুকময়ী। এক কথায় অসাধারণ। কিন্তু সেই অসাধারণই এখন সাধারণ হয়ে গেছে। তার কৌতুক, তার মুখরতা আর প্রগলভতা—কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ছকুরাম অবুঝ হয়ে উঠল, 'চুপ করে থেকো না। কিছু বল—'

এতক্ষণে মুখ খুলল তিলিয়া। খুব আস্তে ফিস ফিস করে বলল, 'কি বলব!'

'এই যে তুমি আর আমি দু-জনে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ছকুরাম। কথাটা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারল না।

'দু-জনে কী?' দু'টি বড় বড় দূরগামী চোখ মেলে তিলিয়া তাকাল।

'জগনপরসাদকে দেখে আমরা এমন হয়ে গেলাম কেন?'

তিলিয়া জবাব দিল না। তার মুখ দেখে মনে হ'ল, পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছকুরাম থামে নি, 'কেন সারা রাত আমরা ঘুমোতে পারি নি? কেন তুমহার গালে আঁশুর (চোখের জলের) দাগ?'

'জানি না—' আবছা গলায় তিলিয়া বলল।

'জানো জানো—' ছকুরাম অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। 'জরুর জানো।'

তিলিয়ার ঠোঁটে ম্লান একটু হাসি ফুটল। চোখ নামিয়ে ঝাপসা গলায় সে বলল, 'জানি তো বলছ, লেকেন—'

'কী ?'

'জেনে কি লাভ !'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না ছকুরাম। অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে শুরু করল, 'সব লাভ কি টাকা-পয়সার মত হিসেব করে পাওয়া যায় ! এই যে তুমহার আর আমার মন—'

'বল, বল ছকুয়াজি।' দু-চোখে অসহ্য পিপাসা নিয়ে তিলিয়া আবার তাকাল।

'তুমহার আর আমার মন যা চায় তা যদি পেয়ে যায়, আমাদের জীবনটা কি-রকম হয় বল তো ! তার চেয়ে বড় লাভ আর কিছু আছে ?'

'লেকেন—'

'কী ?'

'আমাদের দু-জনের মন যা চায় তা তো পাব না।'

'কেন ?'

'কেন আবার, মাঝখানে জগনপরসাদ এসে পড়েছে যে।' অস্থির গলায় তিলিয়া বলল।

'জগনপরসাদকে মাঝখান থেকে সরে যেতে হবে।' স্থির অবিচলিত স্বরে ছকুরাম বলল।

'তা কেমন করে হয় ?'

'হবে না-ই বা কেন ?'

'আসছে মাসে শাদি হবে বলে বাপুজি তার মাকে পাকা কথা দিয়েছে যে।'

'কথাই শুধু দিয়েছে। লেকেন শাদিটা তো আর হয়ে যায় নি।'

'পাকা কথা দেওয়া আর শাদি হয়ে যাওয়া একই ব্যাপার।'

'না, এক ব্যাপার নয়।'

তিলিয়াকে এবার চিন্তিত দেখাল। চোখদুটো তার ঈষৎ কুঁচকে গেছে। কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটে বেরিয়েছে। আস্তে আস্তে সে শুধলো, 'কী বলতে চাও তুমি ?'

একটু ইতস্তত করল ছকুরাম। তারপর বলল, 'ধনপতজিকে বলব জগনপরসাদদের সাথ তুমহার শাদি যেন ভেঙে দ্যায়।'

তিলিয়ার চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। খুব গাঢ় গলায় সে বলল, 'তারপর?'

'তারপর তুমহার আর আমার মন যা চায় ধনপতজির কাছে তা-ই চাইব।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না তিলিয়া। বেশ কিছুক্ষণ পরে অসহ্য সুখে সে বলল, 'সচ্ বলছ?'

'হাঁ-হাঁ সচ্।' ছকুরাম আরো একটু কাছে এগিয়ে এল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ একসময় তিলিয়া বলল, 'লেকেন—'

'কী?' ছকুরাম জানতে চাইল।

'বাপুজি যদি জগনপরসাদদের সাথ শাদি ভেঙে দিতে রাজী না হয়, তা হ'লে?'

'তা হলে—' তিলিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কাঁপা স্বরে ছকুরাম বলল, 'তা হ'লে কী করব তুমিই বলে দাও।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিলিয়া বলল, 'আমি বলতে পারব না।'

'তুমি তো বলতে পারবে না। তা হ'লে আমি বলি?'

'না।'

'হাঁ।' ছকুরাম বলতে লাগল, 'মহাভারতের গল্প জান তো। সেই যে অর্জুনজি সুভদ্রাজিকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল তেমনি তুমহাকেও আমি নিয়ে যাব।

মহাভারতের কাহিনী তিলিয়া জানে না। কিন্তু 'হরণ' শব্দটার অর্থ বোঝে। বোঝে বলেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

পঁচিশ

জগনপ্রসাদের পণ একশ টাকা আর বিয়ে ঠিক করে দেওয়ার জন্য সখিলালের পারিশ্রমিক কুড়ি টাকা, মোট একশ' কুড়ি টাকা। তা ছাড়া বিয়ের অন্যান্য খরচ রয়েছে। জামা-কাপড় এবং কিছু রুপোর গয়না কিনতে হবে। পড়শীদের মিঠাই খাওয়াতে হবে। মিলিয়ে প্রায় তিন শ টাকার দরকার।

কিন্তু ধনপতের হাতে সাকুল্যে পঞ্চাশটির বেশি টাকা নেই। তাই সে ঠিক করল, ধার করবে।

তার বাড়িতে কোনদিন কোন উৎসব হয় নি। নিজে সে বিয়ে করে নি। দু-একটা ভাই-বোনও যদি থাকত, তা হ'লেও না হয় কথা ছিল। তাদের উপলক্ষ করে আনন্দ করতে পারত। কিন্তু সেদিক থেকেও ধনপত বঞ্চিত। তার গৃহ চিরদিনই নিরানন্দ, নিরুৎসব।

এই গোবীগাঁও-এ সব বাড়িতেই বিয়ে হয়, শিশু জন্মায়। সে সব নিয়ে হাসিতে খুশিতে মানুষগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এতকাল দূর থেকে ধনপত তাদের দেখেছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। নিজের স্ত্রী-হীন সন্তানহীন নিঃসঙ্গ জীবনটাকে বড় নিরর্থক মনে হয়েছে তার। এই কলরবহীন স্তব্ধ বাড়িটা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তিলিয়া আসার পর ধনপতের দুঃখ ঘুচেছে। সে স্থির করেছে রীতিমত ঘটা করে মেয়েটার বিয়ে দেবে। তিলিয়াকে ঘিরে সাধ মিটিয়ে তার জীবনের প্রথম এবং শেষ উৎসবটা করে নেবে। তার জন্য যত টাকা ধার করতে হয়, সে রাজী।

জগনপ্রসাদরা তিলিয়াকে দেখে যাবার দিন দুই পর ধনপত টাকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। যেখানে যত জানা-শোনা মানুষ ছিল সবার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না।

আড়াই শ' টাকার মত তার দরকার কিন্তু সাধারণ কৃষাণের ঘরে অত টাকা থাকে না।

টাকা কেউ দিতে পারল না কিন্তু সৎ বুদ্ধিটা সবাই দিয়ে দিল, 'লেড়কিটা তুমহার নিজের কেউ নয়। একেবারে পর। তার শাদির জন্যে কি-না ধার করতে বেরিয়েছ! তা আবার একটা-দুটো পয়সা না, আড়াই শ রুপেয়া! মালুম হচ্ছে শাদিতে খুব ঘটা করবে। লেকেন মুরুখ আর মাথা খারাপ না হলে কেউ অত ঘটা করে পরের লেড়কির শাদি দেয় না। বুঝলে?'

ধনপত উত্তর দিল না। কেমন করে সে বোঝাবে শুধুমাত্র তিলিয়ার জন্যই না, তার নিজের জন্যও তিলিয়ার বিয়েতে ঘটা করা একান্ত প্রয়োজন।

কারো কাছ থেকে টাকা না পেয়ে নিরাশ এবং চিন্তিত মুখে সখিলালের বাড়ি গেল ধনপত।

সখিলাল বাড়িতেই ছিল। উঠানের এককোণে যে ঝুমকু ফুলের বাগানটা রয়েছে সেখানে বসে খুরপি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করছিল। ধনপত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

খুরপি রেখে সখিলাল মুখ তুলল। বলল, 'কি রে, কি মনে করে?'

'ভারি মুশকিলে পড়েছি সখি ভেইয়া!' ধনপতকে অত্যন্ত বিপন্ন দেখাল।

'চল্, ঘরে যাই। সেখানে বসে তোর সব কথা শুনব।' ধনপতকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে বসল সখিলাল। শুধলো, 'কী মুশকিলে পড়েছিস?'

ধনপত শুরু করল, 'আমার অবস্থা তো তুমি সবই জান। হাতে মাত্তর পঞ্চাশটা রুপেয়া আছে। এদিকে জগনপ্রসাদের পাঁচ শ-ও রুপেয়া, তুমহার বিশ রুপেয়া, তা ছাড়া বিয়ের খরচ—সব মিলিয়ে তিন শ' রুপেয়ার ধাক্কা। অত রুপেয়া কোথা থেকে জোগাড় করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সখিলাল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। ভাবল, টাকার জন্য পিছিয়ে গিয়ে ধনপত যদি এই বিয়ে ভেঙে দেয় তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এই বিয়েটাকে ঘিরে সে যে চক্রান্ত

করেছে সেটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার ইচ্ছা, এই বিয়েটার বিপক্ষে গ্রামের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে ধনপতকে তাড়াবে। কিন্তু বিয়েটাই যদি শেষ পর্যন্ত না হয়, ধনপতকে গ্রামছাড়া করা অসম্ভব। ধনপত গ্রামে থাকলে তার সঙ্গে সেই মামলাটা চলতেই থাকবে। আর মামলা যদি চলে ইহ জীবনে আর দেড় বিঘে জমি উদ্ধার করা যাবে না।

কাজেই যেমন করে হোক তিলিয়া আর জগনপ্রসাদের বিয়ে দিতেই হবে। সখিলাল স্থির করল, নিজের কুড়িটা টাকা ছেড়ে দেবে। এতে উদারতা দেখানোও হবে। আবার টাকা জোগাড়ের দুশ্চিন্তাও থেকে ধনপতকে খানিকটা অন্তত মুক্তও করা যাবে। কিছুটা দুশ্চিন্তাও যদি লাঘব হয় বিয়ের ব্যাপারে ধনপত উৎসাহিত হবে।

সখিলাল বলল, 'তোর অবস্থা সবই জানি। তাই বলছি আমার বিশটা রুপেয়া না হয় না-ই দিলি। ওটা আমি ছেড়েই দিলাম।'

সখিলাল যা ভেবেছিল তাই হ'ল। তার দুটো হাত ধরে ধনপত বলল, 'তুমি আমায় বাঁচালে ভেইয়া। বহুত কিরপা (কৃপা) তুমহার, বহুত কিরপা।'

সখিলাল জবাব দিল না।

ধনপত থামে নি, 'বিশটা রুপেয়া তো তুমি ছেড়ে দিলে। জগনপরসাদরা যদি পণটা ছেড়ে দিত বড় ভাল হ'ত।'

'তা কি তারা ছাড়বে!' এবার মুখ খুলল সখিলাল। তার চোখে-মুখে সংশয় দেখা দিল।

'চল না একবার ভরতপুর। আমার অবস্থার কথা তাদের বুঝিয়ে বলি! বোঝালে জরুর তারা বুঝবে।'

'যেতে যখন চাইছিস চল্।'

'কবে যাবে?'

'আজ আর হবে না। কাল সকালে যাব।'

পরের দিন সকালে সখিলালের সঙ্গে ভরতপুর গেল ধনপত। সুভদ্রা দাওয়ায় বসে সুপুরি কুচোচ্ছিল। তাদের দেখে ব্যস্তভাবে

উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসুন—আসুন—'

ধনপতরা দাওয়ায় গিয়ে উঠল।

সুভদ্রা এবার শুধলো, 'হঠাৎ এলেন যে, কুছু দরকার আছে ?'

সখিলাল উত্তর দিল, 'হাঁ, শাদির ব্যাপারে ধনপত আপনাকে ক'টা কথা বলবে।'

ধনপতের দিকে ফিরে সুভদ্রা বলল, 'কী কথা ?'

একটু ইতস্তত করল ধনপত। তারপর সোজা সুভদ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করল, 'আপনি যদি কিরপা করে পণটা ছেড়ে দেন ভারি উপকার হয়।'

'পণ ছেড়ে দেব ! কি বলছেন আপনি ?' কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল সুভদ্রা। তারপর বলল, 'আপনাকে তো সেদিনই বলেছি, পণ নেওয়াটা আমাদের বংশের রেওয়াজ। ওটা হ'ল ছেলের সম্মানের ব্যাপার। কাজেই ছাড়তে পারব না।'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে ধনপত বলল, 'দেখুন আমি বড় গরীব। পণটা যদি না-ই ছাড়েন কিছু অন্তত কমিয়ে নিন।'

সুভদ্রা হাসল। খুব শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একটু ঘুরে দেখুন ধনপতজি। জগনপরসাদের মত ছেলেরা ওর চেয়ে বেশি পণ চাইবে। এক শ টাকা পণ চাওয়া আমার অন্যায় হয় নি।'

থতমত খেয়ে গেল ধনপত, 'না-না—সে-কথা আমি—'

কথাটা তাকে শেষ করতে দিল না সুভদ্রা। তার আগেই বলে উঠল, 'দরাদরি আমি পসন্দ্ করি না। ঐ শ রুপেয়া থেকে একটা পয়সাও আমি কমাতে পারব না।'

'কিরপা তা হ'লে পাব না ?'

'আমার কথা তো আমি বলেই দিয়েছি। ওর নড়চড় হবে না।'

বিষণ্ণ মুখে ধনপত বলল, 'তা হলে আর কি, আজ আমরা চলি।'

সুভদ্রা বলল, 'তাই কখন হয়। দুপুর হয়ে গেছে, চান-টান করে যা হয় দুটি মুখে দিন। তারপর বিকেলে যাবেন।'

'না-না, আজ খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করবেন না। এখনই

আমরা যাব।'

'লেকেন শুধু মুখে ফিরে গেলে আমি শাস্তি পাব না।'

সুভদ্রার অনুরোধটা রাখল না ধনপত। আর কোন কথা না বলে উঠে পড়ল। দেখাদেখি সখিলালও উঠল।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে সখিলাল বলল, 'মেয়েমানুষ হলে হবে কি? রুপেয়া-উপেয়ার ব্যাপারে জগনের মা দেখছি ভারি সেয়ানা।'

'হাঁ—' অন্যমনস্কের মত বলল ধনপত।

'একটা পয়সাও সে ছাড়লে না!'

'না।'

এরপর কেউ আর কিছু বলল না।

অনেক্ষণ চলবার পর হঠাৎ ধনপত ডেকে উঠল, 'সখি ভেইয়া—'

'কি বলছিস?' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সখিলাল।

'কোন সুরাহাই তো হ'ল না। তুমি অবশ্য বিশটা রুপেয়া ছেড়ে দিলে। তাতে আর কতটা লাভ হ'ল! এখনও কম করে সওয়া দু'শ রুপেয়া জোগাড় করতে হবে। অত রুপেয়া কোথায় যে পাব! ভাবছি, শাদিটা ভেঙে দেব কি-না।'

সখিলাল আঁতকে উঠল, 'কি যা-তা বলছিস! কত কষ্ট করে লেড়কাটা পাওয়া গেছে। এই শাদিটা ভেঙে দিলে কোনদিন আর তিলিয়ার শাদি দিতে পারবি?'

'সবই বুঝি সখি ভেইয়া। লেকেন সওয়া দু শ' রুপেয়া আমি কোথায় পাব?'

চোখ বুঁজে কি যেন ভাবল সখিলাল। তারপর বলল, 'এক কাজ কর—'

'কী?' ধনপত উন্মুখ হ'ল।

'কারো কাছ থেকে ধার নে। রুপেয়া একদিন না একদিন শোধ করতে পারবি। জগনপরসাদের মত লেড়কা যদি একবার হাতছাড়া হয়ে যায় পরে আপসোস করতে হবে।'

অল্প একটু হাসল ধনপত। বলল, 'তুমি মনে করেছ ধারের চেষ্টা আমি করি নি! অনেক করেছি। আমাদের গৌরীগাঁওএ যত আদমি আছে সবার কাছে গেছি।'

'কেউ ধার দিল না?' সখিলাল প্রশ্ন করল।

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ধনপত। বলল, 'কোথা থেকে তারা অত রুপেয়া দেবে! সবাই তো আমার মতই গরীব।' একটু থেমে আবার বলল, 'ধার না পেয়েই তো তুমহার কাছে গিয়েছিলাম। তুমি কিরপা করেছ। জগনপরসাদের মা যদি পণটা ছেড়ে দিত বেঁচে যেতাম। আমি যে কি করব!' বলতে বলতে গভীর এক ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেল সে।

সখিলালও ভাবছিল। হঠাৎ সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছে এমন একটা উৎফুল্ল ভঙ্গি করে সে বলল, 'আরে শুধু শুধু আমরা চিন্তা করে মরছি। রুপেয়া তো তোর ঘরেই রয়েছে।'

'আমার ঘরে!' ধনপত অবাক হয়ে গেল।

'হাঁ-হাঁ, তোর ঘরেই।'

'তুমি কি বলছ, বুঝতে পারছি না।'

'পারছিস না?'

'না।'

'আরে ঐ যে আদমিটা, মরসুমের সময় তোর কোঠিতে এসে থাকে, কি যেন নাম তার?'

'ছকুরাম।'

'হাঁ-হাঁ, ছকুরাম। ওর তো সুদের কারবার, তাই না?'

'হাঁ।'

'ওর কাছ থেকেই তো ধার নিতে পারিস।' ধনপতের মুখের দিকে তাকাল সখিলাল।

কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইল ধনপত। সত্যিই তো, টাকা ঘরে থাকতে সে কি-না অন্তহীন দুর্ভাবনা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতে চেষ্টা করল, ছকুরামের কথাটা এতদিন কেমন করে সে বিস্মৃত হয়েছিল?

একসময় অবাক ভাবটা কাটল। ধনপত বলল, 'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ সখি ভেইয়া। ছকুরামের কাছ থেকেই রুপেয়া নেব।'

ছাব্বিশ

ক'দিন ধরেই কথাটা বলার চেষ্টা করছে ছকুরাম। পারছে না। রোজই সে ভাবে সন্ধ্যেবেলা আভনপুর থেকে ফিরে এসে বলবে। কিন্তু ধনপতের কাছে গিয়ে বসলে অপরিসীম লজ্জায় তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

এদিকে রোজই তাড়া দিচ্ছে তিলিয়া। কোনদিন সে বলে, 'এখনও বাপুজিকে বললে না। শেষে একটা মুশকিলই হবে।' কোনদিন বলে, 'আমার ওপর তুমহার কোন টান নেই। টান থাকলে জরুর এতদিন বলতে।' কোনদিন বা অভিমানে তার ঠোঁট স্ফুরিত হয়, 'তুমহার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। ঐ ভরতপুরেই আমার শাদি হবে আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

তাড়া খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল ছকুরাম। একদিন আভনপুর থেকে ফিরে সে স্থির করল, লজ্জা-সঙ্কোচ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আজ সে কথাটা বলবেই।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

খাওয়া চুকিয়ে ধনপত আর ছকুরাম নিজের নিজের বিছানায় বসে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

খুক খুক করে একটু কাশল ছকুরাম। একবার ধনপতের মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। তারপর ঈষৎ কাঁপা গলায় ডাকল, 'ধনপতজি—'

কি যেন ভাবছিল ধনপত। মুখ তুলে বলল, 'কি বলছ।'

'তুমহার সাথ আমার একটা কথা আছে। ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম বলব। লেকেন—'

ছকুরামের কথা শেষ হবার আগেই ধনপত বলে উঠল, 'তাজ্জবের ব্যাপার!'

'তাজ্জব কেন ?' ছকুরামের গলার স্বরে বিস্ময় ফুটল।

'আরে তুমহার সাথ আমারও একটা কথা আছে। ক'দিন ধরেই বলতে চাইছি, লেকেন পারছি না।'

'কী কথা ?' ছকুরাম শুধলো।

'তুমি ভরোসা দিলে বলতে পারি।'

'না শুনে কি করে ভরোসা দি, বল।'

'তা অবশ্য ঠিক।' ধনপত মাথা নাড়ল। তারপর শুরু করল, 'আমায় সওয়া দু শ' রুপেয়া ধার দিতে হবে।'

'ও, এই কথা !'

'হাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম না জানি কি।' একটু থেমে কি ভেবে ছকুরাম বলল, 'অত রুপেয়া দিয়ে তুমি কি করবে !'

'তিলিয়ার শাদি ঠিক করেছি। তার জন্যে খরচ আছে তো।' ধনপত বলতে লাগল, 'লেড়কার পণ দিতে হবে শ রুপেয়া, কাপড়-গয়না কিনতে হবে, পড়শীদের মিঠাই খাওয়াতে হবে।'

শুনতে শুনতে কি যেন হয়ে গেল ছকুরামের। উত্তেজিত ক্ষিপ্ত গলায় চিৎকার করে উঠল, 'ভেবেছ কি ? ঘটা করে ধরমবিটিয়ার শাদি দেবে আর তার জন্যে রুপেয়া জোগাব আমি !'

কিছুক্ষণ বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল ধনপত। সে ভেবেই পেল না টাকা চাওয়াতে কি অপরাধ হয়েছে ! বিমূঢ় ভাবটা কাটলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'এমনি-এমনি তো রুপেয়া চাইছি না। অন্য সবাইকে যেমন ধার দাও আমাকেও তেমনি দেবে। তার জন্যে ন্যায্য সুদ আমি দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না ছকুরাম। অনেকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে রইল সে। তারপর চোখ নামিয়ে খুব শান্ত স্বরে বলল, 'রুপেয়া আমি তুমহাকে দিতে পারি।'

ছকুরামের গলার স্বরে একটু আগের উত্তেজনা বা ক্ষিপ্ততা কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধনপত অবাক হয়ে গেল। দশ বছর এই মানুষটাকে

দেখছে সে। কিন্তু তার মেজাজ আজও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারল না। কখন যে সে কী মূর্তিতে থাকবে আগে থেকে বলা দুরূহ। তার চরিত্র চিরদিন ধনপতের কাছে দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে গেল।

ছকুরাম আবার বলল, 'রুপেয়া দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। লেকেন—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে ধনপত তাকাল।

'আমার একটা কথা আছে।'

'বল।'

'বলছিলাম কি, অত রুপেয়া ধার কোরো না। এত বয়েস হয়েছে তুমহার। ভগোয়ান না করে, ফট করে যদি তুমি চোখ বোঁজ কে তুমহার ধার শোধ করবে!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ধনপত। গভীর গলায় বলল, 'তুমি যা বললে তা আমি ভেবে দেখেছি ছকুয়া। লেকেন ধার না নিয়ে কোন উপায় নেই। আমার হাতে অল্প কিছু রুপেয়া আছে। ধার না নিলে তিলিয়ার শাদি দিতে পারব না।'

ছকুরাম বলে উঠল, 'ধারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ধরমাবটিয়ার শাদি দেওয়া আমি পসন্দ্ করি না।'

'তবে তুমি কী করতে বল?' ধনপত প্রশ্ন করল।

কি যেন চিন্তা করে ধনপতের মুখের দিকে তাকাল ছকুরাম। তারপর চাপা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'এ শাদিটা তুমি ভেঙে দাও।'

'শাদি ভেঙে দেব! কি বলছ ছকুয়া!' ধনপত চমকে উঠল।

ছকুরাম জবাব দিল না।

ধনপত বলতে লাগল, 'জানো কত কষ্ট করে জগনপরসাদকে জোগাড় করেছি!'

এবারও ছকুরাম নিরুত্তর।

ধনপত সমানে বলে যাচ্ছে, 'তিলিয়ার শাদি একবার ভেঙে গেছে। সেই জন্যে ওর জাতের কেউ ওকে শাদি করতে রাজী না। ভিন দেশী ভিন জাতি জগনপরসাদ ওকে শাদি করতে রাজী হয়েছে। এখন যদি

সম্বন্ধটা ভেঙে দি নতুন করে কোথায় আমি লেড়কা খুঁজতে যাব !'

'লেড়কা খুঁজতে হবে না।'

দু-চোখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে ধনপত বলল, 'তুমহার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল ছকুয়া।'

'কি-রকম ?' ছকুরাম শুধলো।

'এদিকে বলছ জগনপরসাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে। আবার বলছ নতুন করে লেড়কা খুঁজতে হবে না। তা হ'লে লেড়কিটার শাদি হবে কেমন করে ?'

থেমে থেমে কাঁপা গলায় ছকুরাম বলল, 'লেড়কা তো তুমহার হাতেই আছে।'

'আমার হাতে আছে !' ধনপতের বিস্ময় বাড়তে বাড়তে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল।

'হাঁ।'

'কে সে ?'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলে উঠতে পারল না ছকুরাম। অনেকক্ষণ নত-চোখে আড়ষ্টের মত বসে রইল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিছুই কি দেখতে পাওনা ধনপতজি। একেবারে অন্ধ তুমি।'

'তার মানে তুমি—তুমি—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না ধনপত। গলাটা তার বুজে গেল।

অবরুদ্ধ জড়িত স্বরে ছকুরাম বলল, 'হাঁ আমি—আমি। ভিন দেশী ভিন জাতির হাতে তিলিয়াকে দিতে যখন তুমহার আপত্তি নেই তখন আমার হাতেই ওকে দাও। একটা পয়সা পণ তুমহাকে দিতে হবে না। শাদির যা খরচ লাগে, আমিই দেব।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা খুঁজে পেল না ধনপত। একটা অসহ্য বিচিত্র অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমনটা সে প্রত্যাশা করে নি। ছকুরাম যে এমন একটা প্রস্তাব দিতে পারে এ ছিল তার কাছে অকল্পিত, অভাবনীয়।

একসময় আচ্ছন্নতা কেটে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ধনপত, 'তুমি—তুমি তিলিয়াকে নেবে ছকুয়া! কি ভাগ্যি আমার! কালই আমি ভরতপুর গিয়ে শাদি ভেঙে দিয়ে আসব। কত বাহানা ওদের। শ রুপেয়ার কম পণ নেবে না। না নিলে না নিবি। তোদের ঘরে আমি মেয়ে দেব না।'

ছকুরাম কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

ধনপত এবার বলল, 'তা হ'লে ছকুয়া—'

'কী?' ছকুরাম সাড়া দিল।

'তুমহার মা-বাপের ঠিকানাটা দাও। তাদের সাথ দেখা করে শাদির কথা পাকা করে ফেলি।'

ছকুরাম চমকে উঠল, 'বিয়ে তো করব আমি। বাপ-মাকে দিয়ে কি হবে?'

'বা রে, এমন একটা শুভ কাজ, বাপ-মা ছাড়া কখনও হ'তে পারে!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ছকুরাম। আস্তে আস্তে তার ভুরু কুঁচকে বেঁকে গেল। চোখের তারা আর চোয়ালদুটো হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। কপালে অনেকগুলো গভীর জটিল রেখা পড়ল। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতে তাকে অমানুষিক দেখাতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে একসময় সে বলল, 'বাপ-মাকে ছাড়া ছেলের শাদি কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই না?'

হাঁ।' ধনপত মাথা নাড়ল। বলল, 'অবশ্য বাপ-মা বেঁচে না থাকলে জেঠা-খুড়ো বড় ভাই কি জ্ঞাতি কারুকে না কারুকে দরকার। আসল কথাটা কি জান?'

'কী?'

'যার হাতে লেড়কি দেব শুধু তাকে হ'লেই তো চলবে না। তার বংশের অন্য সবাইকেও দেখতে হবে।'

'লেকেন—'

'কী?'

'আমার যে কী বংশ জানি না।' নির্মম নিস্পৃহ মুখে ছকুরাম বলল।

'কি পাগলের মত যা-তা বলছ!' সস্নেহে মৃদু ধমক দিল ধনপত, 'দুনিয়ায় বংশ ছাড়া কোন মানুষ আছে নাকি!'

'ভগোয়ান কসম ধনপতজি। কোন বংশে আমি জন্মেছি বলতে পারব না। কারা যে আমার বাপ-মা-ভাই-বহিন, কারা যে আমার জেঠা-খুড়ো-জ্ঞাতি, কি যে তাদের পরিচয়, কিছুই আমি জানি না।'

ধনপত শিউরে উঠল। কাঁপা অস্থির স্বরে বলল, 'তুমি যা বলছ তার মানে বোঝ? কারা তাদের বাপ-মা-আত্মীয়-স্বজন আর বংশের পরিচয় বলতে পারে না! জান তারা কারা?'

'কারা তারা?'

'তারা হ'ল সেইসব কুত্তার দল যাদের জন্মের ঠিক নেই।' ধনপতের মুখচোখ এবং গলার স্বর থেকে অপরিসীম ঘৃণা ঝরে পড়ল।

আর বুক ফাটিয়ে অতর্কিতে চেঁচিয়ে উঠল ছকুরাম, 'চুপ কর চুপ কর, তুমহার বিটিয়াকে আমি শাদি করতে চাই না, চাই না, চাই না।' বলেই কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত বসে রইল ধনপত। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি হ'ল তুমহার, এ ছকুয়া তুমহাকে তো আমি কিছু বলি নি। বলেছি তাদের জন্মের ঠিক-ঠিকানা নেই।'

ছকুরাম জবাব দিল না।

আর কিছু বলতে সাহস পেল না ধনপত। বসে বসে ছকুরামের এই অস্বাভাবিক আচরণটার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করল। কোন লাভ হ'ল না।

সাতাশ

পরের দিন যথারীতি বেলা করেই ঘুম থেকে উঠল ধনপত। বিছানা তুলতে গিয়ে বালিশের তলায় একটা চিঠি আর সোয়া দু-শ টাকা পেল সে। সেগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। এই টাকাগুলো আর চিঠিটা যে কার এবং কেমন করে তার বালিশের তলায় এল, বুঝে উঠতে পারল না সে।

অবাক ভাবটা কাটলে ধনপত ভাবল, তার নিজের এত টাকা নেই। তা ছাড়া ষাট বছরের জীবনে পৃথিবীর কোন মানুষের কাছ থেকে কোন চিঠি পায় নি। তার মন বলল, এ-সব নিশ্চয়ই ছকুরামের। খুব সম্ভব ভুল করে ছেলেটা তার বালিশের তলায় রেখেছে। এগুলো তাকে ফেরত দিতে হবে।

যদিও ধনপত জানে এত বেলা পর্যন্ত ছকুরাম বাড়ি থাকে না, ভোর হ'তে না হ'তে আভনপুর চলে যায় তবু ঝোঁকের মাথায় তাকে ডাকতে গেল। ডাকতে গিয়েই দেখল, ছকুরাম তো ঘরে নেই-ই, এক কোণে তার যে স্তূপীকৃত মালপত্র ছিল সেগুলোও নেই। তবে কি ছকুরাম চলে গেছে! কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতের সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে একটা তরঙ্গ খেলে গেল।

লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এল সে। দাওয়ায় একটা দড়ি টাঙানো রয়েছে। সেখানে ছকুরামের গামছাটা ঝুলত। গামছাটা এখন দেখা গেল না। মোষের ঘরে গিয়ে দেখল টাট্টুটাও অদৃশ্য হয়েছে। কোন সংশয় নেই। নিজের সমস্ত কিছু নিয়ে ছকুরাম চলে গেছে। আর যাবার সময় তার বালিশের তলায় টাকা আর চিঠিটা রেখে গেছে।

মোষের ঘর থেকে বেরিয়ে স্তব্ধ নিশ্চল একটা মূর্তির মত দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রইল ধনপত। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল হুঁশ নেই। এক সময় কে যেন ডাকল, 'বাপুজি—বাপুজি—'

চমকে মুখ ফেরাল ধনপত। দেখল কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে

তিলিয়া।

তিলিয়া শুধলো, 'অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?'

কথাটার জবাব দিল না ধনপত। ভাঙা ভাঙা জড়িত স্বরে শুধু বলল, 'ছকুরাম চলে গেছে।'

ধনপতের গলায় এমন কিছু আছে যাতে মনে মনে শঙ্কিত হ'ল তিলিয়া। ভয়ে ভয়ে বলল, 'চলে গেছে!'

'হাঁ, তার জিনিসপত্তর যা কিছু ছিল সব নিয়ে কাল রাত্রে কখন যেন চলে গেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাই নি। মনে হচ্ছে, সে আর ফিরবে না।' ধনপত বলতে লাগল, 'যাবার সময় আমার বালিশের তলায় সওয়া দু-শ রুপেয়া আর একটা চিঠি রেখে গেছে।'

তিলিয়া আর কিছু বলল না। শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

তিলিয়ার এই ফোঁপানির মধ্যে আচমকা একটা বিচিত্র সত্য আবিষ্কার করল ধনপত। ছকুরাম আর এই মেয়েটার ভেতর নিশ্চয়ই গভীর কিছু আছে। নইলে ছকুরাম চলে যাওয়াতে মেয়েটা কাঁদবেই বা কেন? আর কাল রাত্রে অন্য জায়গায় সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে জেনেও ছকুরাম তিলিয়াকে বিয়ে করতেই বা চাইবে কেন? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ধনপতের। যেদিন জগনপ্রসাদরা তিলিয়াকে দেখে গেল তারপরের দিন সকালে উদ্‌ভ্রান্তের মত আরক্ত চোখে বারান্দায় বসে ছিল ছকুরাম। সেদিন অমন ভাবে তার বসে থাকবার কারণটা ঠিক-মত বুঝতে পারে নি ধনপত। আজ কারণটা তার কাছে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে গেল।

ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছে তিলিয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কান্নার শব্দটা শুনল ধনপত। শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় চিঠিটার কথা মনে পড়ল। চিঠিতে কি আছে জানা দরকার।

জানা তো দরকার কিন্তু নিজে সে পড়তে পারে না। কারুকে দিয়ে

পড়িয়ে নিতে হবে। কাকে দিয়ে পড়াবে? এই গ্রামে কেই বা লেখা-পড়া জানে। ভাবতে ভাবতে বুড়ো সখিলালের কথা মনে পড়ল। এই গ্রামে সখিলালই একমাত্র শিক্ষিত লোক। তার পেটেই যা কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে। ধনপত তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা পর সখিলালকে সঙ্গে করে ফিরে এল সে।

তিলিয়া এখনও মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মত কুয়োর কাছে বসে রয়েছে। কান্নার উচ্ছ্বাসটা এখন আর নেই। শুধু মাঝে মাঝে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সখিলালের হাতে সেই চিঠিটা দিয়ে ধনপত বলল, 'পড়ে শোনাও তো সখি ভেইয়া—'

সখিলাল পড়তে লাগল—

তিলিয়া,

এখন অনেক রাত। নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি ও-ঘরে ঘুমোচ্ছ। এ-ঘরে ঘুমোচ্ছে ধনপতজি। আর আমি তোমার উদ্দেশে চিঠি লিখছি।

এই চিঠিটা কাল সকালে যখন তোমরা পাবে তখন তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক, অনেক দূরে। কোথায় আমি যাচ্ছি নিজেই জানি না। আমাকে তোমরা খুঁজো না। মনে রেখ, পৃথিবীটা সীমাহীন না হ'লেও বিশাল। যতই খোঁজ আমাকে পাবে না।

বাইরে শীতের রাত্রিটা স্তব্ধ হয়ে আছে। গোরীগাঁও গ্রামটা অতল ঘুমে তলিয়ে রয়েছে। তোমাদের ঘুম ভাঙবার আগেই রাত থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ব।

তুমি আমার সব পরিচয় জান না। তবু অকুণ্ঠ বিশ্বাসে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলে। তোমার সেই বিশ্বাসের কোন মর্যাদাই রাখতে পারলাম না।

আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি বললে ঠিক বলা হয় না। তোমাদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

কেন পালিয়ে যাচ্ছি, সে-কথা তোমাদের জানানো দরকার। তার

আগে আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস তোমাকে শুনতে হবে।

বহুবার তুমি আমার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। একের পর এক অগণিত প্রশ্ন করেছ। কিন্তু কোনদিন তোমার কৌতূহল মেটেনি। কোনদিন কোন উত্তর পাও নি।

বিশ্বাস কর তিলিয়া, তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চেয়েছিলাম। পারি নি। বুকের ভেতরটা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে তবু গলায় স্বর ফোটেনি। হয়ত ওপর থেকে আমাকে হৃদয়-বর্জিত বর্বর মনে হয়েছে তোমার। কিন্তু যদি বুঝতে আমার প্রাণে একটা অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে, যদি দেখতে আমার বুকের গভীরে অজস্র রক্ত ঝরেছে বুঝিবা আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যেত। কিন্তু তা তো হয় না। বুকের ভেতরের রক্ত তো মানুষের চোখে পড়ে না।

যাইহোক, আজ আমি তোমাকে সব বলব। কোন কিছু গোপন করব না। নিজেকে একেবারে উন্মুক্ত অনর্গল করে দেব।

তুমি হয়ত ভাবতে পার, পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমার জীবন-কাহিনীর কী সম্পর্ক? সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা গভীর এবং অচ্ছেদ। নইলে পালানোর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে সে-কথা বলতাম না।

অনেকদিন আগে ধনপতজিকে একবার বলেছিলাম, আমাদের দেশ বিহারের চম্পারণ জেলা আর জাতে আমি মৈথিলি ব্রাহ্মণ। কথাগুলো কতদূর সত্য, সে সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে।

কোথায় আমার জন্ম জানি না। জন্মের প্রথম কয়েকটা বছর কোথায় ছিলাম, তাও বলতে পারব না।

যখন আমার বয়স সাত-আট সেই সময় থেকে অবশ্য সব কথা মনে আছে। তখন আমি বিহারের চম্পারণ জেলায়। ধনপতজিকে বলেছি, ঐ জায়গাটা আমার দেশ। সত্যিই ওটা আমার দেশ কি-না, আজও জানি না।

মনে পড়ে, চম্পারণে এক গৃহস্থের বাড়ি চাকর খাটতাম। বিরাট

অবস্থা তার। এক'শ বিঘে ক্ষেতি, গোরু-মোষ মিলিয়ে পঞ্চাশ-বাটটা। মোষের গাড়িই দশটা। কুড়ি-বাইশটা গোলা। ছোটখাট এক জমিদারই বলা যায় তাকে।

আমার কাজ ছিল আরো জন পাঁচেক চাকরের সঙ্গে দিনের বেলা মাঠে গিয়ে গোরু-মোষ আগলানো আর রাত্রিবেলা মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের বউর পা টিপে দেওয়া।

দ্বিতীয় পক্ষের এই বউটির নাম কুশী। কুশী অপরূপা রূপসী। রূপসীই নয়, যুবতীও। মালিকের চেয়ে কম করে বাইশ-চব্বিশ বছরের ছোট সে। তার দাপটে প্রৌঢ়ত্ব উত্তীর্ণ মালিক থেকে শুরু করে বাড়ির সমস্ত মানুষ জুজু হয়ে থাকত।

কুশীর রূপ ছিল কিন্তু হৃদয় ছিল না। ওপরটা তার যত চকচকে, ভেতরটা ততই অন্ধকার সমস্ত দিন গোরু-মোষ চরিয়ে রাত্রিবেলা তার পা টিপতে টিপতে কখনও যদি ঢুলুনি লাগত তা হ'লে আর নিস্তার ছিল না। নৃশংসের মত সে আমাকে মারত। প্রথমে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি। তাতে হয়রান হয়ে পড়লে লাঠি-জুতো-দা-বঁটি, যা হাতের সামনে পেত তাই দিয়ে পিটত।

এমন ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন বিকালে মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখি মালিকের গুরুজি এসেছেন। থলথলে বিশাল দেহ তাঁর। মাথার সামনের দিকের চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পেছন দিকে মোটা টিকিতে গাঁদা ফুল বাঁধা। চোখদুটো রক্তবর্ণ, পরনে গরদের ধুতি আর ফতুয়া, পায়ে খড়ম। দু-কানে সোনার মাকড়ি। কপালে শ্বেত চন্দনের মস্ত এক ফোঁটা।

ঘরের বারান্দায় একটা জাজিমের ওপর গুরুজি বসেছিলেন। মালিক থেকে শুরু করে বাড়ির যাবত মানুষ তটস্থ হয়ে আছে। গুরুজির আপ্যায়নে আর অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি না ঘটে যায়।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে গুরুজিকে দেখছিলাম।

মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার দিকে তাকালেন গুরুজি।

আরক্ত চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে তাঁর ভুরু এবং কপাল কুঁচকে যেতে লাগল।

আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এর আগে কোথায় যেন তাঁকে দেখেছি। কোথায় দেখেছি, ঠিক স্মরণ করতে পারছিলাম না। জন্মের পর প্রথম কয়েকটা বছর যার কথা আমার মনে নেই, যেখানে আমার স্মৃতি পৌঁছয় না, খুব সম্ভব গুরুজি সেই বিস্মৃতিলোকের কেউ হবেন।

পরস্পরের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। একসময় গুরুজি গর্জে উঠলেন, 'ওটা—ঐ নোংরা আবর্জনাটা এখানে কেন?'

মালিক ভয়ে ভয়ে বলল, 'ও আমাদের চাকর। গোরু মোষ আগলায়।'

'তুমি জান, ও কে? কী ওর পরিচয়?' গুরুজি মালিকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেছিলেন।

'না তো।' রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল মালিক।

'আগে ঐ পাপটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও। তারপর ওর সম্বন্ধে তোমাকে সব বলব। ওটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে ভারি অপবিত্র মনে হচ্ছে।'

গুরুজির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মালিক এবং বাড়ির অন্য লোকেরা একসঙ্গে সবাই আমার দিকে তাকাল। তাদের দৃষ্টি নিষ্ঠুর, হিংস্র, ক্রুর। মনে হ'ল, একদল হৃদয়হীন শ্বাপদ নখ-দাঁত আর থাবা মেলে ওত পেতে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে আমার ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা জমাট বেঁধে গেছে। আর পা দুটো কেউ যেন পেরেক ঠুকে মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। নিষ্প্রাণ একটা পুতুলের মত আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। যতদূর মনে পড়ে একসময় মালিক চিৎকার করে উঠেছিল, 'মার শালাকে, মেরে চৌপাট করে বাড়

থেকে তাড়িয়ে দে।'

মালিকের চিৎকারে চকিত হয়ে উঠছিলাম। নিমেষে আমার সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা সরে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠান বেরিয়ে প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলাম।

চম্পারণ থেকে ক্রমাগত দৌড়ে কখনও বা হেঁটে প্রায় না খেয়ে নির্জীবের মত ধুঁকতে ধুঁকতে মনিহারীতে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আশ্রয় পেলাম স্কুলের এক পণ্ডিতজির কাছে।

পণ্ডিতজি বিপত্নীক মানুষ, তাঁর কেউ নেই। পৃথিবীর কেন কিছু সম্বন্ধে তাঁর সামান্য আকর্ষণও ছিল না। স্কুলে গিয়ে ছেলেদের পড়াতেন। আর অবসর সময়ে জপ-তপ-পূজা-আহ্নিক নিয়ে মগ্ন থাকতেন। দেখলে মনে হয়, একেবারে নির্মোহ মানুষ।

কিন্তু আপাত চোখে পণ্ডিতজি যতখানি মোহহীন ভেতরে ভেতরে ততটা নন তাঁর প্রাণের গভীরে শূন্য সংসার সম্পর্কে একটা হাহাকার ছিল। স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রবল তৃষ্ণা ছিল। কিন্তু কেউ না থাকায় ধীরে ধীরে নিরাসক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাকে পেয়ে দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন পণ্ডিতজি। তাঁর প্রাণের সবটুকু স্নেহ যেন আমার ওপর বর্ষিত হতে লাগল।

তিনি শুধু আমাকে আশ্রয়ই দিলেন না। স্কুলেও ভর্তি করে দিলেন।

আমার মেধা ছিল। শিখবার এবং জানবার আগ্রহ ছিল। পড়াশোনায় ফল ভালই করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার যেন জন্মান্তর ঘটতে লাগল।

এতকাল মানুষের বাড়িতে চাকর খেটেছি। মাঠে গোরু-মোষ চরিয়েছি। মালিকের বউর পা টিপেছি আর নির্দয়ভাবে মার খেয়েছি। সেই জীবনটায় গ্লানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পণ্ডিতজির কাছে আশ্রয় পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। প্রাণধারণের মধ্যে শুধু যে অগৌরব আর যন্ত্রণাই নেই আনন্দও আছে, আগে আর

কখনও জানি নি। আমার এতদিনের অপমানিত আত্মা পণ্ডিতজির কাছে সেই আনন্দের স্বাদ পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল।

কিন্তু জন্মমুহূর্তে সব ক'টি গ্রহই বোধহয় আমার প্রতি বিরূপ ছিল। নইলে চার-পাঁচ বছর পরেই এমন আশ্রয় হারাব কেন?

পণ্ডিতজি যে স্কুলে পড়াতেন আমিও সেই স্কুলে পড়তাম। আমার আগে আগে ছুটি হয়ে যেত। বাড়ি এসে পণ্ডিতজির জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি ফিরে এলে দু-জনে একসঙ্গে জলখাবার খেতাম।

একদিন স্কুল থেকে এসে যথারীতি বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছি। বেশ দেরি করেই বাড়ি ফিরলেন পণ্ডিতজি। তাঁর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর, ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে। ঘাড়টা ভেঙে গেছে যেন। ফলে মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। এলোমেলো পায়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত টলতে টলতে তিনি বারান্দায় উঠে এলেন।

পণ্ডিতজিকে আগে আর কখনও এমন দেখি নি। চার-পাঁচ বছর তাঁর কাছে আছি। সব সময় তাঁকে দেখেছি প্রসন্ন, আনন্দময়। পৃথিবীর কারো সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই, কোন কিছুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। একটি শান্ত গভীর হাসিতে তাঁর মুখখানা সর্বক্ষণ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতজির থমথমে গম্ভীর মুখের সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না। কাজেই চমকে উঠলাম। আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু একসঙ্গে চকিত হয়ে উঠল। মনে হ'ল, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে।

পণ্ডিতজি আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোজা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ শাণিত বিশ্লেষণী চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন।

কিছু একটা বলতে চাইলাম। পারলাম না ভয়ে আমার গলায় স্বর ফুটল না।

হঠাৎ পণ্ডিতজি ডেকে উঠলেন, 'ছকুরাম—'

উত্তর দিলাম না। ভীত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলুন।' এতক্ষণে আমার গলার স্বর ফুটল।

'তোমাকে আমার বাড়ি রাখা আর সম্ভব হবে না।'

'কেন, কী করেছি।' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

'কিছুই করো নি। তোমার কোন দোষ নেই।'

'তবে আমাকে আপনার কাছে রাখবেন না কেন?'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন পণ্ডিতজি। তারপর বললেন, 'চম্পারণ থেকে আজ একজন লোক এসেছিল আমাদের স্কুলে। সে তোমাকে দেখেছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছে তুমি আমার কাছে থাক।'

'তারপর?' দমবন্ধ চাপা গলায় প্রশ্ন করলাম।

'তারপর—' পণ্ডিতজি বলতে লাগলেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছে সে।'

'কা—কী বলেছে?'

'সে বড় সাঙ্ঘাতিক কথা। আমার মুখ থেকে শুনতে চেও না।'

'না-না, আপনি বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।'

'শুনবেই তা হ'লে?'

'হ্যাঁ।'

একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতজি শুরু করলেন, 'লোকটা বলে গেল তোমার বাবা মৈথিলি ব্রাহ্মণ আর মা—' এই পর্যন্ত বলেই জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না—না, আর কিছু আমি বলতে পারব না। সে বড় ভয়ানক ব্যাপার। এমন বাপ-মায়েরও সন্তান হয়!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ পরস্পরের দিকে আমরা শুধু তাকিয়ে রইলাম।

একসময় পণ্ডিতজি বলে উঠলেন, 'তোমার বাপ-মার জন্যেই তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারব না। ভাবছি, অন্য কোথাও তোমার থাকার ব্যবস্থা করব। ভাবছি—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ফুঁপিয়ে উঠলাম, 'সারা জীবন অনেক দুখ পেয়েছি, অনেক কষ্ট করেছি। আপনার কাছ থেকে কোথাও আমি যাব না। কোথাও না।'

'যেতে তোমাকে হবেই। না জেনে তোমার মত পাপকে আশ্রয়

দিয়েছিলাম। সে-জন্যে অনুতাপ হচ্ছে।' পণ্ডিতজিকে অত্যন্ত হিংস্র আর নিষ্ঠুর মনে হ'ল। তার মুখে-চোখে গলার স্বরে স্নেহের লেশমাত্র নেই।

'আমি যাব না, যাব না।' অবুঝের মত ফোঁপাতেই লাগলাম।

আমার কান্নায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না পণ্ডিতজি। বললেন, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি শোন। পাটনার কাছে একটা অনাথ আশ্রম আছে। ভাবছি, কালই তোমাকে সেখানে রেখে আসব। যাদের কেউ নেই সেখানে তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে চাকরি দিয়ে দেয়।'

বুঝলাম, পণ্ডিতজি কিছুতেই তাঁর কাছে আমাকে রাখবেন না। তাঁর কৃপা থেকে আমি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছি।

অথচ এতকাল পণ্ডিতজি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল আমার! ভাবতাম, তিনি মহৎ অসাধারণ। কোনদিন ঈশ্বর দেখি নি। ঈশ্বর যদি কোথাও থেকে থাকে, হয়ত পণ্ডিতজির মতই হবে।

দেখেছি তাঁর স্নেহের সীমা-পরিসীমা নেই। নইলে রাস্তা থেকে তুলে এনে তিনি আমাকে আশ্রয় দেবেন কেন? তাঁর স্নেহের প্রসঙ্গে একটিমাত্র উপমা আমার মনে হয়েছে। সেটা হ'ল চাঁদের আলো। চাঁদের আলোর মতই তা স্নিগ্ধ, সর্বব্যাপী। আমার বিশ্বাস ছিল কোন দিন কোন অবস্থায় এবং কোন অপরাধে তাঁর করুণা হারাব না।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হ'ল, পণ্ডিতজি ঈশ্বর নন। অতি সাধারণ সামান্য মানুষ। অন্য সবার মতই তাঁর করুণা, মহত্ত্ব কিংবা উদারতা একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর। সেই সীমাটা তিনি কিছুতেই অতিক্রম করতে পারেন না। হয়ত কোন মানুষই পারে না।

কিংবা কোন মানুষই বোধহয় অপরকে স্নেহ করে না। যা করে, সেটা হ'ল স্নেহের ভান মাত্র। সামান্য একটু আঘাতেই সেই ভানটার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। পণ্ডিতজি কি আমার সঙ্গে এই ক'টা বছর স্নেহের নামে ছলনাই করে গেলেন।

আমার বাবা-মা সম্বন্ধে কি শুনেছেন, পণ্ডিতজিই জানেন। বাবা-

মা যদি কোনো অন্যায় করেই থাকে আমার তাতে দোষ কোথায়? বিনা দোষে আমার প্রতি কেন বিমুখ হবেন পণ্ডিতজি? ক্ষোভে দুঃখে আমার প্রাণের ভেতরটা উত্তাল হয়ে উঠল।

পণ্ডিতজি থামেন নি, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। কাল ভোরে পাটনার ট্রেন। ঐ ট্রেনেই আমরা যাব।'

আমার কি যেন হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠলাম, 'কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি পাটনা যাব না।'

'পাটনা যাবে না?'

'না।'

'তবে কী করবে?'

'যে রাস্তা থেকে আপনি আমাকে তুলে এনেছিলেন, সে-ই রাস্তায় গিয়ে নামব। ভয় নেই, আপনার বাড়িতে আর থাকব না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম। পা-দুটো এবং মাথাটা টলতে লাগল। শুধু পা আর মাথাই না, মনে হ'ল, চারপাশের পৃথিবীটাও টলমল করছে।

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বিড় বিড় করে পণ্ডিতজি বললেন, 'ভগোয়ান তোমার ভাল করুন।'

কিছু না বলে সামনের পথে গিয়ে নামলাম।

পণ্ডিতজির বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে গেলাম কাটিহার, কাটিহার থেকে পূর্ণিয়া। পূর্ণিয়ার পর ভাগলপুর। সেখান থেকে দ্বারভাঙা। তারপর ছাপরা। কোথাও চার মাস, কোথাও ছ মাস, কোথাও বা বছর খানেক—এর বেশি থাকতে পারি নি। স্থায়ী আশ্রয় কোথাও জোটে নি। যেখানেই গেছি সেখানেই আঘাত পেয়েছি, প্রতারিত হয়েছি। সে-সব আঘাত আর প্রতারণার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। আশা করি, নিজেই তুমি অনুমান করে নিতে পারবে।

অনেক ঘুরলাম আমি। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত পাটনায় এলাম। সেখানে এক মোটরের কারখানায় কাজ জুটল। হিসাব-পত্তর রাখার কাজ। মাইনে সত্তর টাকা। তখন আমার বয়স একুশ-বাইশ।

কারখানার মালিক মানুষ হিসেবে মোটামুটি মন্দ না। আমি যে

তার বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, এ-কথাটা সে মনে রাখত না। এমনভাবে মিশত যেন আমি তার সমশ্রেণীর। মাঝে মাঝে বলত, 'শাদির বয়েস তো হয়ে গেছে। এবার সুন্দর দেখে একটা বউ ঘরে আন।'

মালিকের কথাগুলো শুনতে শুনতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। কোনদিন যে বিয়ে করব, ভাবি নি। এ ছিল আমার পক্ষে অভাবিত, অকল্পনীয়। আমার যা জীবন তাতে বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জন্মাবধি ভাগ্য নামে একটা নিষ্ঠুর ব্যাধ আমার পিছু পিছু তাড়া করে এসেছে। একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর প্রাণধারণের মত একটা জীবিকার জন্য ক্রমাগত ছুটে বেড়িয়েছি। বিয়ের কথা ভাবার অবকাশ কোনদিন আমার হয় নি।

মালিকের কথার উত্তরে বলতাম, 'কি বলছেন আপনি! আমি শাদি করব!'

'হাঁ, শাদি করবে। এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে। শাদি করাটা জীবনের একটা ধর্ম; তাকে বাদ দিয়ে কোন মানুষই সম্পূর্ণ নয়।'

'লেকেন—'

'কী?'

'কে আমাকে লেড়কি দেবে?'

'এ দেশে লেড়কি দেবার লোকের অভাব! ও-সব তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শাদি কর, আমি লেড়কির ব্যবস্থা করে দেব।'

'আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন?'

'জরুর।' মালিক বলে যেত, 'তোমার বাপ-মা কেউ নেই। আমার কাছে আছ। তোমাকে সংসারী করে দেওয়া তো আমার কর্তব্য।'

আমি বিয়ে করব, একটি যুবতী মেয়েকে চিরকালের জন্য কাছে পাব, সচেতনভাবে এ-সব কথা কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু আমার অবচেতনে হয়ত একটি সঙ্গিনীর স্বপ্ন ছিল। এতকাল বুঝতে পারি নি। মালিকের কথা শুনতে শুনতে আমার বুকের গভীর থেকে সেই স্বপ্নটা লাফ দিয়ে উঠে এল। একদিন বিয়েতে রাজী হয়ে গেলাম।

মালিক বলল, 'কিছু মনে কর না ছকুরাম। কি যেন তুমহার জাত ?'

আমার যে কী জাত, জানতাম না। মনিহারীর পণ্ডিতজির মুখে শুনেছিলাম, আমার বাবা মৈথিলি ব্রাহ্মণ। নিয়ম অনুসারে বাপ এবং ছেলের জাত অভিন্ন হওয়াই তো উচিত। বললাম, 'আমি মৈথিলি ব্রাহ্মণ।'

'তা হ'লে তো ফাল্গুন মাসে তোমাকে সৌরাট যেতে হবে। এটা অঘ্রাণ মাস। আরো দু-মাস সবুর কর।'

সৌরাট যাব কেন ?'

'তুমহাদের মৈথিলিদের বিয়ের সম্বন্ধ তো ঐ খানেই হয়। ফাল্গুন মাস পড়লেই যেখানে যত মৈথিলি আছে সব ওখানে গিয়ে জমা হবে। তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়ের শাদি ঠিক করবে।' আমার দিকে তাকিয়ে মালিক প্রশ্ন করল, 'এ সব তুমি জান না ?'

সত্যিই মৈথিলি সমাজের এই নিয়ম আমি জানতাম না। জানবই বা কেমন করে ? জন্মাবধিই আমি বাপ-মা ছাড়া। শুধু বাপ-মা-ই না, সমাজ-বংশ-গোত্র এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন। কাজেই সামাজিক বা কৌলিক কোন রীতি-নীতিই আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মালিকের প্রশ্নের জবাবে আমাকে চুপ করেই থাকতে হ'ল।

দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস এসে গেল। মালিক নিজে আমাকে নিয়ে সৌরাট রওনা হ'ল।

মালিক যা বলেছিল, হুবহু তাই। সৌরাটে যেন মেলা বসে গেছে। দেশে যত মৈথিলি ব্রাহ্মণ ছিল ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই সেখানে হাজির হয়েছে।

ঘুরে ঘুরে অনেক মেয়ে দেখলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত একজনকে পছন্দ হ'ল। নাম তার পার্বতী।

পার্বতীর বাবার নাম সুমিত্রানন্দনজি। তিনিও আমাকে পছন্দ করলেন। পছন্দ না করে অবশ্য উপায় ছিল না।

এটা অবশ্য অহঙ্কারের কথা। তবু বলব, আমার দিকে তখন যে

তাকাত সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। সুমিত্রানন্দনজিও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

উর্মিলয়া, তুমি আমাকে দেখেছ এমন একটা সময় যখন আমার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। সৌন্দর্য-রূপ-মাধুর্য-যৌবন—সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সৌরাটে যখন বিয়ে ঠিক করতে গিয়েছিলাম তখন আমি সর্বনাশা যাদুকর। তখন যদি তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ত, দেখতে আমার সমস্ত দেহ মধ্যযৌবনের দীপ্তিতে ঝলমল। শুধু যৌবন আর অপরিমিত স্বাস্থ্যই না, আমার রূপও তখন অফুরন্ত। দীর্ঘ ভুরুর নীচে প্রায়-ঘুমন্ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা রক্তাভ ঠোঁট, পাকা সোনার মত গায়ের রঙ। ক্ষীণ কটি আর বিস্তৃত বুক। সব মিলিয়ে আমি তখন অসাধারণ সুপুরুষ।

আমাকে দেখে পার্বতীর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বলতে পারব না। কারণ একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। আর তাকায় নি। কিন্তু তার বাবা সুমিত্রানন্দনজি চোখ ফেরাতে পারেন নি। বার বার তিনি বলেছিলেন, 'পুরুষমানুষের এমন রূপ আর কখনও দেখি নি।' তাঁর গলার স্বর থেকে মুগ্ধতা উপচে পড়ছিল, 'আমার কি এত ভাগ্য হবে! পার্বতীর জন্যে এমন ছেলে কি পাব!'

মালিক আমার পাশেই ছিল। বলে উঠল, 'জরুর পাবেন! আপনার মেয়ে আমাদের পসন্দ্ হয়েছে। ছকুরামকে আপনার ভাল লেগেছে। এ শাদি আটকাবে না।'

'আপনাদের দয়া।'

'দয়া-টয়া বলে লজ্জা দেবেন না।' মালিক বলতে লাগল, দু'পক্ষেরই যখন মত আছে তখন শাদির কথাটা পাকা করে ফেলুন। আজ ফাল্গুন মাসের সাত তারিখ। আমার ইচ্ছে দু-চার দিনের মধ্যেই শাদিটা চুকিয়ে ফেলব। সবচেয়ে আগে যে দিনটা পাওয়া যায়, সেটাই ঠিক করে ফেলুন। দেনা-পাওনার জন্য ঠেকবে না।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'আমার একটা মোটরের কারখানা আছে। যদ্দিন না ফিরছি কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে থাকবে। ভীষণ ক্ষতি হবে তাতে।

তাই বলছি যত তাড়াতাড়ি হয়—'

মালিকের কথা শেষ হবার আগেই বিব্রত মুখে সুমিত্রানন্দনজি বলে উঠলেন, 'লেকেন—'

'কী ?'

'আমি তো শাদির ব্যাপারে পাকা কথা বলতে পারব না।'

'কেন ?'

'আমাদের বংশের একটা প্রথা আছে।' সুমিত্রানন্দনজি বলতে লাগলেন, 'আমাদের যিনি কুলগুরু তিনিই আমাদের অভিভাবক। আমাদের ছেলেমেয়েদের শাদির ব্যাপারে যা কিছু কথাবার্তা তিনিই বলেন। আমরা অবশ্য পাত্র-পাত্রী ঠিক করে দি। লেকেন শাদি হবে কি হবে না, সে সম্বন্ধে পাকা কথা বলার মালিক গুরুজি। এ নিয়ম আমরা অমান্য করি না।'

'তা হ'লে তো আপনাদের গুরুজির সঙ্গে কথা বলতে হয়।'

'হাঁ।'

'লেকেন তাকে পাব কোথায় ?'

'এখানেই পাবেন।' সুমিত্রানন্দনজি বললেন, 'তিনি চিঠি দিয়েছেন, দু রোজ পর আসবেন। দয়া করে যদি এই দুটো দিন অপেক্ষা করেন—'

'কি আর করব। মেয়ে যখন পসন্দ্ হয়েছে অপেক্ষা করতেই হবে।' মালিক হাসল।

দিন দুই পর সুমিত্রানন্দনজি আমাদের দু-জনকে তাঁর গুরুজির কাছে নিয়ে গেলেন।

গুরুজিকে দেখেই চিনলাম। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম। চম্পারণ থেকে এঁরই জন্য আমাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

গুরুজি আমাকে ভালভাবে লক্ষ্য করেন নি। ভাসা-ভাসা ভাবে একটু তাকিয়েই বলতে লাগলেন, 'বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর! আমাদের পার্বতীর পাশে খাসা মানাবে একে।' বলতে বলতেই তাঁর দৃষ্টি প্রখর

হ'ল। তীক্ষ্ণ গভীর চোখে নিনিমেষে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গর্জে উঠলেন, 'শুয়ারকা বাচ্চা, এখানে এসেও জুটেছিস! বুকের পাটা আছে তোর। লেকেন ঐ পাটাটা আমি লাথি মেরে ভেঙে দেব।'

আমার মালিক এবং সুমিত্রানন্দনজি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঘোর কাটলে মালিক ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'আপনি এ-সব কি বলছেন!'

'ঠিকই বলছি।' উত্তেজিত গুরুজি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মালিককে বললেন, 'ও কে জানেন?'

'জরুর জানি, ওর নাম টুকুরাম। আমার কারখানায় কাজ করে।'

'নামটা না হয় জেনেছেন। লেকেন—'

'কী?'

'ওর পরিচয় জানেন?'

একটু থতমত খেয়ে মালিক বলল, 'পরিচয় মানে—'

'মানে কে ওর বাপ, কে ওর মা, কারা ওর আত্মীয়-স্বজন, কোথায় ওর পিতৃপুরুষের দেশ, এই সব আর কি।'

এ-সব তো, এ-সব তো—' মালিক আমতা-আমতা করতে লাগল। মুখচোখ দেখে মনে হ'ল রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সে।

'কিছুই আপনি জানেন না। হয়ত সুন্দর চেহারা দেখে নিজের কারখানায় কাজ দিয়েছিলেন।' গুরুজি বলতে লাগলেন, 'লেকেন ওর সব পরিচয় যদি জানতেন—'

কি পরিচয় ওর?' মালিক শুধলো।

এতক্ষণ সুমিত্রানন্দনজি নিঃশব্দে এই নাটকীয় ব্যাপারটা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'কে ও?'

'ও একটা মহাপাপ। ওর বাপ মৈথিলি বামহন ঠিকই, লেকেন ওর মা বাজারের একটা বেশ্যা। নরকে ওর জন্ম।' স্থির অবিচলিত স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন গুরুজি।

মালিক দু-কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ—'

সুমিত্রানন্দনজি বললেন, 'ভাগ্যিস আপনি সব খবর জানতেন গুরুজি! ঐ পাপটার হাতে লেড়্‌ক দিলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হ'ত।'

সেই প্রথম নিজের জন্মপরিচয় জানলাম। জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা ফেটে যাচ্ছে। শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত আদিম সরীসৃপের মত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে অসহ্য কি একটা যেন ওঠানামা করছিল। পায়ের তলায় যেন মাটি নেই। চারদিকে কেউ নেই কিছু নেই। অতল এক শূন্যতার মধ্যে আমি একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

নতচোখে অনড় একটা মূর্তির মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই।

হঠাৎ গুরুজি চিৎকার করে উঠল, 'শুয়ারকা বাচ্চা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুমিত্রানন্দন ওটার গায়ে লোহা পুড়িয়ে একটা দাগ করে দাও। লোকে দেখেই যেন চিনতে পারে ওটার জন্মের ঠিক নেই।'

চমকে মুখ তুললাম। দেখলাম গুরুজি, সুমিত্রানন্দনজি আর মালিক ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চোখে যুগপৎ ঘৃণা আর ধিক্কার। এমনভাবে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যাতে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত আবর্জনাটাকে দেখছে।

কেউ আমাকে করুণা করল না, ক্ষমা করল না, হাত বাড়িয়ে কাছে টানল না। আস্তে আস্তে তাদের সামনে থেকে সরে গেলাম।

কিন্তু সরে যাব কোথায়? পৃথিবীর সবার কাছে থেকে হয়ত পালানো যায় কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালানো দুঃসাধ্য। বুঝিবা কোন মানুষই নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

আমার পিছু পিছু আমার জন্মের ঘৃণ্য ইতিহাসটা তাড়া করে চলল।

তিলিয়া, তোমাকে একদিন বলেছিলাম আমার মা বাদিয়ার মেয়ে। আমার বাবার সঙ্গে তার মহব্বত হয়েছিল। মিথ্যে কথা আসলে আমার মা একজন দেহ-ব্যবসায়িনী। সেদিন তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে পারি নি। মিথ্যে আমি বলি না। মিথ্যে আমার জীবন-বিরুদ্ধ। কিন্তু সেদিন তোমার কাছে বলেছিলাম জীবনে সেই আমার একমাত্র মিথ্যে বলা।

মনিহারীর পণ্ডিতজির মুখে শুনেছিলাম আমার বাবা মৈথিলি ব্রাহ্মণ। এতকাল নিজের সম্বন্ধে এটুকুই মাত্র জানতাম। সে একরকম ভালই ছিল। কিন্তু গুরুজির মুখে যেই মুহূর্তে শুনলাম আমার মা দেহ-ব্যবসায়িনী এবং সমাজের বাইরে এক পঙ্ককুম্ভে আমার জন্ম। সেই মুহূর্তে জীবনটা আমার কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে গেল।

পৃথিবীর কোথাও আমার জন্য এতটুকু স্থান নেই। যে-ই আমার জন্ম-পরিচয় জানবে সে-ই আমাকে ঘৃণা করবে। কাছে গেলে দূর করে দেবে। তাই স্থির করলাম, আত্মহত্যা করব। নিজের কলঙ্কিত ধিকৃত ঘৃণিত জীবনটাকে জগৎ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

অনেক চেষ্টা করেছি আমি। রেললাইনে গিয়ে শুয়ে থেকেছি। কিন্তু ট্রেন যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেছি। একবার ক্ষুর দিয়ে কণ্ঠনালী ছিন্ন করতে চেয়েছিলাম। গলায় ক্ষুরটা ঠেকিয়েও ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপ দিতে পারি নি। হাতটা থরথর করে কেঁপে গিয়েছিল। আর একবার নদীতে নেমে অথৈ জলে চলে গিয়েছিলাম। সাঁতার জানতাম না। আমার বিশ্বাস ছিল এইবার আমি মরতে পারব। কিন্তু নাকে কানে জল ঢুকে নিঃশ্বাসটা যখন বন্ধ হয়ে আসছিল তখন চিৎকার করে উঠেছিলাম। নদীর পার থেকে একটা লোক সাঁতারে গিয়ে আমাকে তুলে এনেছিল।

পারি নি পারি নি, যে জীবনটার প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা এত

বিরাগ তাকে নিজের হাতে শেষ করে দিতে পারি নি।

যখন মরতে পারলাম না তখন ঠিক করলাম পরিচিত মানুষের মধ্যে আর থাকব না। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে কোথাও চলে যাব।

ঘুরতে ঘুরতে মধ্যপ্রদেশ এলাম। বেঁচেই যখন আছি তখন জীবনধারণ বলে একটা প্রশ্নও আছে। নিজের চলার মত কিছু রোজগার করা দরকার। সে জন্য একটা জীবিকা চাই।

পাটনায় মোটরের কারখানায় কাজ করে হাজারখানেক টাকা জমিয়েছিলাম। অনেক ভেবচিন্তে সেই টাকা দিয়ে সুদের ব্যবসা শুরু করলাম।

মধ্যপ্রদেশের গঞ্জে গঞ্জে টাকা খাটিয়ে বেড়াতে লাগলাম আমি। প্রথম প্রথম পায়ে হেঁটেই ঘুরতাম। বেশ কিছু টাকা হাতে জমার পর একটা টাঙা কিনে নিলাম।

জগতে এত বৃত্তি থাকতে কেন সুদের ব্যবসা ধরলাম? তিলিয়া, তুমি যদি একটু তলিয়ে দেখ, নিজেই বুঝতে পারবে।

জীবনভর মানুষের কাছে থেকে আমি যা পেয়েছি তা হ'ল শঠতা, প্রবঞ্চনা, ঘৃণা আর ধিক্কার। আমার বাপ-মা থেকেই শুরু করা। তারা আমাকে কি দিয়েছে? কিছুই না। সব বাপ-মাই তাদের সন্তানের জন্য টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, বিত্ত-বৈভব রেখে যেতে পারে না। কিন্তু একটা সামাজিক পরিচয় রেখে যায়। আমার বাপ-মা তা-ও রেখে যায় নি। ফল হয়েছে কী? যেখানেই গেছি সেখানেই ঘৃণিত হয়েছি, অপমানিত হয়েছি। সুস্থভাবে যে বাঁচব তার কোন পথ খোলা রেখে যায় নি আমার বাপ-মা। সব দিক থেকেই তারা আমাকে মেরে রেখে গেছে।

বাপ-মাকে আমি দেখিনি। কিন্তু যাদের দেখেছি, যাদের সংস্পর্শে গেছি তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব। তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে তিলিয়া, এই সব মানুষগুলোকে প্রাণ দিয়ে আমি ভালবেসেছি। এদের একটু স্নেহের জন্য কি লালায়িতই না আমি ছিলাম! কিন্তু

আমার ভালবাসা এবং স্নেহ-প্রত্যাশার কোন মূল্যই তাদের কাছে নেই।

আমি জানি, আমার মত সৎ মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সজ্ঞানে কারোকে ঠকাই নি, কারো সঙ্গে মিথ্যাচার করি নি। কিন্তু তাতে লাভটা হয়েছে কী? কিছুই না। আমার ব্যক্তিগত মানবিক পরিচয়টাকে কেউ মর্যাদা দেয় নি। আমার জন্মপরিচয়ের গ্লানিটাকে বড় করে দেখে তারা আমাকে শুধু দূরে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে আমার প্রাণে শেষ পর্যন্ত যা জমা হয়েছিল তা হ'ল অসহ্য জ্বালা আর আক্রোশ। সুদের কারবারের মধ্যে সেই জ্বালা আর আক্রোশ ফেটে পড়েছে।

যারা আমাকে ঠকিয়েছে তাদের নাগাল পাই নি। কিন্তু যে নিরীহ খাতকগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে তাদের ওপর দিয়ে নিজের জীবনের সমস্ত অবিচারের শোধ তুলতে লাগলাম।

একটা পয়সা কারুকে আমি ছাড়ি না। যেমন করে পারি নিজের প্রাপ্য আদায় করে নি। তাতে খাতক বাঁচল কি মরল, সেদিকে আমার লক্ষ্য থাকে না।

প্রাণের ভেতর মমতার যে উৎসটা থাকে, বুকের গভীরে যে কোমল বৃত্তিগুলো থাকে, সুদের কারবার করতে করতে সেগুলো একেবারেই শুকিয়ে গেছে। ফলে মানুষ হিসেবে আমি অসম্পূর্ণ, অস্বাভাবিক। মধ্যপ্রদেশের প্রান্তরের মতই আমি রুক্ষ, মরুনীরস। পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য আমার করুণা নেই। সন্ত্রাসের একটা ছায়ার মত আমি শুধু গঞ্জে গঞ্জে সুদ আদায় করে বেড়াই।

ভেবেছিলাম, এমনভাবেই জীবনের বাকী অংশটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু এই মরসুমে এখানে এসে তোমাকে দেখলাম। অপার মমতা দিয়ে তুমি আমাকে ঢেকে দিলে। আমার সমস্ত কাঠিন্য ভেঙে চুরমার করলে। আমার মধ্যে যত অস্বাভাবিকত্ব ছিল সব মুছিয়ে দিলে।

তিলিয়া, মানুষের কাছে থেকে ক্রমাগত আঘাত ছাড়া আমি আর কিছুই পাই নি। দুরন্ত অভিমানে তাই সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল খাড়া করে তার মধ্যে আত্মগোপন করেছিলাম। তুমি সেই দেওয়ালগুলো ভেঙে দিলে।

আমার ধারণা ছিল, কোন মানুষকে আমি যেমন স্নেহ করি না তেমনি আমিও কারো স্নেহের প্রত্যাশী নই।

কিন্তু সে ধারণাটা আমার ভুল। মানুষের স্নেহের জন্য আমার প্রাণে অসহ্য তৃষ্ণা ছিল। আমার মধ্যে যে স্নেহের কাঙালটা অভিমানে অনাদরে এককোণে মুখ গুঁজে ছিল, তুমি তাকে খুঁজে বার করলে। সেবা দিয়ে প্রীতি দিয়ে তাকে একটু একটু করে লোভী করে তুললে।

ছ-মাস আমি এখানে আছি। তুমি আমার চানের জল তুলে দাও, বিছানা পেতে দাও, রান্না করে খাওয়াও। ভেবেছিলাম, এমনভাবেই মরশুমের বাকী দিন ক'টা কেটে যাবে।

কিন্তু সেদিন যখন জগনপ্রসাদরা তোমাকে দেখতে এল আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। বুঝলাম তোমাকে ঘিরে আমার লোভের সীমা-পরিসীমা নেই, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন।

এদিকে তোমার মনও আমার অজানা রইল না। বুঝলাম, তুমিও আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছ।

আজ, এই কিছুক্ষণ আগে ধনপতজির কাছে তোমাকে আমি চাইলাম। খুব খুশী হয়ে ধনপতজি রাজী হ'ল। বলল, 'তুমহার বাপ-মায়ের ঠিকানা দাও, যদি তারা বেঁচে না থাকে, বংশের আর কারও ঠিকানা দাও, তাদের কাছে গিয়ে শাদির কথা পাকা করে আসি।'

কিন্তু বাপ-মা বা আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা আমি কোথায় পাব? তাদের কারোকেই কোনদিন আমি দেখি নি। জন্মের পরই হয়ত আমাকে পথে ফেলে দিয়েছিল। বংশ-পরিচয় আমি জানি না।

লোকের মুখে জন্ম-পরিচয় যেটুকু শুনেছি তার মধ্যে গ্লানি ছাড়া কিছুই নেই।

তিলিয়া, মানুষ যেখানে যতদূরেই থাক না, তার জন্ম-পরিচয়কে কিছুতেই অতিক্রম করে যেতে পারে না। তার জীবনের প্রধান সমস্ত ঘটনার সময় সেটা প্রয়োজন।

ধনপতজি যখন আমার বাপ-মা এবং বংশের কথা জানতে চাইল রূঢ়ভাবে তাকে আমি বললাম, 'তুমহার ধরমবেটিকে আমি শাদি করব না।'

ধনপতজি আমার রূঢ়তাই হয়ত দেখেছে কিন্তু আমার প্রাণের ভেতর যে যন্ত্রণাটা লুকিয়ে আছে সেটা তার চোখে পড়ে নি। কত দুঃখে যে তার মত ভাল মানুষের প্রতি রূঢ় হয়েছি, যদি পার এই কথাটা তাকে বুঝিয়ে বল তিলিয়া।

তিলিয়া, তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম। আমি ডাকলে হয়ত তুমি 'না' বলতে না। কিন্তু আমার জীবনের অন্তহীন অগৌরবের মধ্যে তোমাকে টেনে নিতে ভরসা পেলাম না।

শুধু তুমি আর আমিই তো না, আমাদের যে সন্তানরা আসবে তাদের জন্য কি পিতৃ-পরিচয় আমি রেখে যাব! সমস্ত জীবন তো নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি জ্বলছি। সেই যন্ত্রণার উত্তরাধিকার তাদের দিয়ে যেতে পারব না। তারা কারো স্নেহ পাবে না, করুণা পাবে না। পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে শুধু বঞ্চিতই হবে। নিজের সুখের জন্য তাদের জীবন নষ্ট করার অধিকার আমার নেই।

তাই আমি ঠিক করেছি, চলে যাব।

তিলিয়া, এই মরসুমটাকে কোনদিন ভুলব না। এই মরসুমে আমি তোমার দেখা পেয়েছি। নারীর ভালবাসা যে কী বস্তু পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কোনদিন জানি নি। তোমার কাছে এসে জানলাম। আরো জানলাম নারীর ভালবাসা হচ্ছে সেই সঞ্জীবনী যা মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। এই দিন ক'টা আমার জীবনে দুর্লভ আশীর্বাদের মত।

অফুরন্ত মমতায় তুমি আমাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছ। আমার

আর দুঃখ নেই।

রাত ফুরিয়ে এসেছে। একটু পরেই তোমরা জেগে উঠবে। তার আগেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

আমার বলার আর কিছু নেই। শুধু যাওয়ার আগে ধনপতজীর বালিশের তলায় এই চিঠিটা আর সোয়া দু'শ টাকা রেখে যাচ্ছি। ঐ টাকাটা যেন তোমার বিয়েতে খরচ করা হয়।

জগনপ্রসাদকে বিয়ে করো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও।

ধনপতজিকে বলো সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। যদি পার, তুমিও ক্ষমা ক'র। ইতি—

ছকুরা